মূলস্রোতের বাইরে

স্বরূপ গোস্বামী

মূলস্রোতের বাইরে

স্বরূপ গোস্বামী

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ২০২৩

যোগাযোগ

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক,

কলকাতা ১০৬

ফোন

৯৮৩১২২৭২০১

ই-মেল

bengaltimes.in@gmail.com

উৎসর্গ

হাতের তালু একেবারেই চেনে না,
ব্লক ধরে ধরে বাংলাটাকে চেনে।

রাজনীতি নিয়ে যার সঙ্গে রাতে কথা শুরু হয়।
চুপিসারে পূবের আকাশ লাল হয়ে যায়।

সেই অভিরূপ অধিকারীকে।

লেখকের অন্যান্য বই

- ❑ খোলা চিঠি
- ❑ খোলা চোখে, খোলা মনে
- ❑ লাল গোলাপ, লাল কার্ড
- ❑ শুনুন ধর্মাবতার
- ❑ পাল্টা হাওয়া
- ❑ কলম চলছে
- ❑ সাদা–কালোর বাইরে
- ❑ পাহাড়ি পথের বাঁকে
- ❑ বুদ্ধিজীবী সমাচার
- ❑ সুচরিতাসু

সবিনয় নিবেদন

আত্মবিস্মৃত জাতি হিসেবে বাঙালির বিশেষ একটা সুনাম আছে। সে অতীত ভুলে যেতেই বোধ হয় ভালবাসে। অবশ্য সবসময় স্মৃতিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে বেচারা কতটুকুই আর মনে রাখতে পারে!

দৈনন্দিন জীবনে এত ঘটনার ঘনঘটা। কোনটা ছেড়ে কোনদিকে তাকাবেন? অর্ধেক বিষয় তো গণমাধ্যমে উঠেও আসে না। কী জানি, সরকার যদি চটে যায়! আবার সবসময় সরকারকে দোষ দিলেও কিছুটা সরলীকরণ হয়ে যায়। কোনও জিনিস চাপা পড়ে যায় আমাদের নিখাদ অজ্ঞতায়। তার দায়ও বেচারা সরকারের ঘাড়ে চড়ে বসে।

২০১৯। লোকসভা ভোটের ঠিক আগে। বাংলার রাজনীতির উত্তাল এক সময়। তখনও কোভিড নামক বস্তুটি হানা দেয়নি।

রাজ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য তখনও অন্যরকম। তখনও মূল বিরোধী সেই বাম–কংগ্রেস। তখনও দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে বিজেপি উঠে আসেনি। কিন্তু একটু একটু করে তার পটভূমি যেন তৈরি হচ্ছে। সেই বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত কিছু বাছাই লেখার সংকলন নিয়ে আগেই বেরিয়েছে ‘পাল্টা হাওয়া’। ইচ্ছে ছিল, এপ্রিল থেকে জুন— এই তিন মাসের কিছু লেখা সংকলিত করার। কিন্তু ওই তিনমাসেও অন্তত শ পাঁচেক লেখা বেরিয়েছে। বাছাই করা বেশ মুশকিল। তাই বেছে নেওয়া হল শুধু এপ্রিলকে। সেখানেও অনেক লেখা থেকে বাছাই করা কুড়িটি। তাই নিয়ে এবারের সংকলন — ‘মূলস্রোতের বাইরে’।

আবহটাই অন্যরকম। মূলস্রোত মিডিয়া সন্তর্পণে, নানা বাধবাধকতায় অনেককিছুই এড়িয়ে যায়। বেঙ্গল টাইমসে সেসব চাপা দেওয়ার কোনও দায় ছিল না। কাউকে তুষ্ট করার দায়ও ছিল না। সে মুক্ত মনে প্রবাহিত হয়েছে। তারই কিছু সংকলন। আসলে, সেই অশান্ত সময়কে একটু ফিরে দেখার চেষ্টা।

স্বরূপ গোস্বামী

বিদায় সংসদের বাঙালিবাবু

সংসদের বাঙালিবাবু। এই নামে কাউকে চেনেন নাকি? বছর পাঁচেক আগেও যদি লোকসভায় কাউকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন বাঙালিবাবু কে, হয়ত উত্তরটা পেয়ে যেতেন। লোকসভার কোনও কর্মী হয়ত আপনাকে প্রশান্ত মজুমদারের কাছে নিয়ে যেত। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কে প্রশান্ত মজুমদার? অনেকে বলবেন, চিনি না তো। চেনার কথাও নয়। মিমি-নুসরতদের নিয়ে যারা লাফালাফি করবেন, তাঁরা প্রশান্ত মজুমদারকে চিনবেন, এতটা আশা করাও মূর্খামি। অথচ, মাত্র পাঁচ বছর আগেই এই মানুষটা ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ। দিন চারেক আগে তিনি মারা গেলেন। যা হওয়ার, তাই হল। কলকাতার কোনও কাগজে, দু লাইনের খবরও চোখে পড়ল না। কোনও চ্যানেলে তাঁকে নিয়ে এক লাইনের উল্লেখও নেই।

অনেকে হয়ত বলতেই পারেন, এমন এম পি তো অনেকেই থাকেন। কী এমন করেছেন? আসলে, কী কাগজ, কী চ্যানেল,

কলকাতার মিডিয়া কর্তারা সীমাহীন অজ্ঞতায় ডুবে আছেন। কলকাতার কয়েকজন নেতা-মন্ত্রী বা কাউন্সিলরের নাম জানেন, কয়েকজনকে 'দাদা' বলেন। ব্যাস, এতেই তাঁরা ভেবে বসেন, রাজনীতির সবকিছু বোধ হয় তাঁদের নখদর্পনে। থাক সে সব কথা। নিজেদের অজ্ঞতা ঢাক পিটিয়ে না বলাই ভাল। প্রশান্ত মজুমদার কেন বাকিদের থেকে আলাদা, সেটা বরং একটু তুলে ধরা যাক।

সামনে লোকসভা নির্বাচন। কে কতদন হাজির থেকেছেন, কে কটা প্রশ্ন করেছেন, কে কটা বিতর্কে অংশ নিয়েছেন, এইসব নিয়ে নানা পরিসংখ্যান উঠে আসছে। সবনিয়ে একটি তথ্য জানিয়ে রাখা যাক, এই পাঁচ বছরে তৃণমূলের ৩৪ সদস্য মিলে যত না বিতর্কে অংশ নিয়েছেন, তা যোগ করলে যা দাঁড়াবে, একা প্রশান্ত মজুমদারের অংশগ্রহণ সম্ভবত তার থেকে বেশি হবে। অন্তত ২৫ জনের যোগফলের থেকে তো বেশি হবেই। কলকাতার এমপি হলে বা তৃণমূলের এম পি হলে কাগজে/চ্যানেলে হইচই হত। যেহেতু উত্তরবঙ্গের এমপি, তার ওপর বাম শরিক দলের, অতএব এসব জানার কোনও দায় নেই।

এসব ছেড়ে মানুষটার কিছু কর্মকাণ্ডে একটু আলো ফেলা যাক। সাত সকালে উঠেই পড়ে ফেলতেন সমস্ত কাগজ। তারপর স্নান সেরে টুকটাক কিছু মুখে দিয়েই তিনি হাঁটা দিতেন। পরণে ধুতি আর পাঞ্জাবি। কাঁধে সাইড ব্যাগ। তখন হয়ত সকাল আটটা। দিল্লির রাস্তায় এত সকালে কোথায় চললেন বাঙালিবাবু? তিনি চললেন লোকসভায়। প্রাতভ্রমণও হয়ে গেল আর লোকসভাতেও পৌঁছে গেলেন।

কিন্তু সংসদ তো শুরু হয় এগারোটায়। তাতে কী? তিনি পৌঁছে যেতেন সাড়ে আটটা–নটার মধ্যেই। অধিবেশন থাকলে মোটামুটি এটাই ছিল তাঁর রুটিন। এমনিতেই পায়ে হেঁটে আসা সাংসদ তেমন দেখা যায় না। তার ওপর এত সকালে! ফলে, সংসদের কর্মীরা বেশ ভালভাবেই তাঁকে চিনে গিয়েছিলেন। তিনি ঢুকলেই শুরু হয়ে যেত জটলা। তিনিও দিব্যি মেতে উঠতেন আড্ডায়। কখনও তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে মুড়িও খেতেন। নিজের গল্প শোনাতেন, অন্যদের পরিবারের গল্পও শুনতেন। একজন সাংসদ এভাবে প্রাণখোলা গল্প করেন! কর্মীরাও কিছুটা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন তাঁর দিকে। সাংসদদের স্যর বলাই নিয়ম। কিন্তু স্যার শুনলেই তিনি পাল্টা ধমক দিয়ে বসতেন। ‘কীসের স্যর? আমি তো তোমাদের সঙ্গে

কোনও দূরত্ব রাখি না। তাহলে স্যর বলো কেন? আমার বয়স সাতাত্তর। তোমরা বয়সে অনেক ছোট। তাই দাদা বলতে পারো, কাকু বলতে পারো। কিন্তু স্যর বলবে না।' তাই স্যার নয়, কারও কাছে তিনি ছিলেন দাদা, কারও কাছে আদরের বাঙালিবাবু।

'বাঙাবিবাবু' নামটা বেশ পছন্দই হয়েছিল প্রশান্ত মজুমদারের। বেশ গর্ব করেই বলতেন, 'ক্রিকেটের দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি। সিনেমার দাদা মিঠুন চক্রবর্তী। কিন্তু লোকসভায় গিয়ে একবার শুধু বলুন, দাদার কাছে যাব। সবাই আমার কাছেই নিয়ে আসবে। এত বাঙালি এম পি থাকলেও একডাকে দাদা বা বাঙালিবাবু বলতে সবাই কিন্তু আমাকেই বোঝে।'

প্রায় সবসময় পরনে থাকত ঢোলা পাজামা, আর পাঞ্জাবি (কিন্তু সংসদে যাওয়ার সময় পাজামার বদলে ধুতি)। বিয়ে থা করেননি। একেবারেই সাদামাটা জীবন যাপন। ৬২ সালে অর্থনীতিতে এম এ। একসময় স্কুলেও পড়াতেন। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন আর এস পি–র সংগঠনের কাজে। দলের নির্দেশে মাঝপথেই দিলেন চাকরি ছেড়ে। হয়ে গেলেন হোলটাইমার। তাঁকেই করে দেওয়া হল দলের দক্ষিণ

দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক। সেও তিন দশক আগের কথা। মেঠো ভাষায় চালিয়ে গেলেন সংগঠনের কাজ। এতদিন বালুরঘাট লোকসভা আসনটি ছিল তপসিলি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ২০০৯-এ ডিলিমিটেশনে সেই সংরক্ষণ উঠে গেল। এবার তাহলে প্রার্থী কে? একটি নামেই সর্বসম্মতি হয়ে গেল। কঠিন লড়াইয়ে নিপাট ভালমানুষ প্রশান্তবাবুকেই প্রার্থী করল আর এস পি। মৃদু আপত্তি করেছিলেন, 'এই বুড়ো বয়সে এম পি হয়ে কী করব? ওখানকার আদব কায়দা শিখতেই তো পাঁচ বছর লেগে যাবে। সেই কোনকালে এম এ পাশ করেছি। ইংলিশ-টিংলিশ সব ভুলে বসে আছি।'

আপত্তি ধোপে টিকল না। দাঁড়ালেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও জিতলেন। তার পর থেকেই শুরু হল অন্য অধ্যায়। সত্তর বছর বয়সে তিনি যেন নবাগত ছাত্র। সংসদ চালুর ঘন্টা দুয়েক আগেই পৌঁছে যান লোকসভার লাইব্রেরিতে। নিষ্ঠাবান ছাত্রের মতোই চলে পড়াশোনা। সংসদ শুরুর অনেক আগেই ঢুকে পড়তেন কক্ষে। কোনও না কোনও বিষয় নিয়ে তাঁকে যে বলতেই হবে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৯-২০১৪, সেই পাঁচ বছরে বাংলার সংসদদের মধ্যে তিনিই সবথেকে বেশিবার বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। সংখ্যাটা অন্তত পাঁচশো। ধারেকাছেও

নেই অন্যরা। (তৃণমূলের এখনকার সাংসদদের দিকে তাকান। অধিকাংশই হয় শূন্য, না হয় ১, না হয় ২। অধিকাংশই সিঙ্গল ডিজিট। সেখানে তিনি একাই ৫০০। ভাবা যায়! গোটা দেশের মধ্যে সংখ্যার বিচারে প্রথম পাঁচে। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, কতটা ছাপ ফেলেছিলেন।

আরও চমক আছে। শুরুর দিন থেকেই আগাগোড়া বাংলায় ভাষণ। অকপট স্বীকারোক্তি, ‘এত ভেবেচিন্তে ইংরাজি বলার চেয়ে তেড়ে বাংলা বলা অনেক ভাল। আমার দলের মাত্র দুজন এম পি। বেশি সময়ও তো বরাদ্দ থাকে না। তাই সেখানে অল্প সময়ে অনেক কথা বলতে হবে।’ শুধু নিজেই নন, সামিল করলেন অন্যদেরও, ‘সবাইকে বোঝালাম, এত কষ্ট করে ইংরাজি বলার কী দরকার বাপু? বাংলায় বললেই তো পারিস। অনেকেই বাংলা বলতে শুরু করল। কিন্তু সি পি এম থেকে হুইপ দেওয়া হল, তাদের এম পি–রা যেন বাংলায় না বলে। ওরা কষ্ট করে ইংলিশ বলা শুরু করল। আর আমি ঝেড়ে বাংলা চালিয়ে গেলাম।’ আপনার ওপর এমন কোনও নির্দেশ আসেনি? ‘না, তা আসেনি। দলকে জানিয়েছিলাম, যে ভাষায় আমি সাবলীল, সেই ভাষাতেই তো বলব। তবে সংসদে একটা ভুল ব্যাখ্যা হল। অনেকে ভাবল, আমি ইংরাজি

জানি না বলে বাংলা বলি। সেটাই প্রচার করল কেউ কেউ। তখন খুব রাগ হল। একদিন তেড়ে ইংরাজিতে ভাষণ দিলাম। সবাই চিৎকার করতে লাগল, দাদা বাংলা বলুন। এমনকী ভিনরাজ্যের এম পি–রাও বাংলায় বলার জন্য দাবি জানাচ্ছেন। একেবারে শেষবেলায় বললাম, অনেকে বলছে, আমি ইংরাজি জানি না। তাই আজ ইংরাজিতে বললাম। দেখিয়ে দিলাম, ইংরাজি বলতে জানি। কাল থেকে আবার বাংলায় বলব।' ব্যাস, সংসদে হাসির ঝড় উঠে গেল। এমনই মজার, এমনই প্রাণবন্ত এক মানুষ ছিলেন প্রশান্ত মজুমদার।

তিস্তার জলবন্টন থেকে লোকপাল বিল, কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি থেকে রেলবাজেট, সন্ত্রাসবাদ থেকে বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে রেল চলাচল— সব ব্যাপারেই সোচ্চার বাঙালিবাবু। সঙ্গে থাকত পেপারকাটিংয়ের ফাইল ও লোকসভার নানা নথি। কবে কী বলেছেন, রীতিমতো সেই নথি থেকে দেখিয়ে দেবেন। ইন্টারনেট থেকে বের করা প্রিন্ট আউটে চমকে দেওয়ার মতো নানা তথ্য। আপনি তাহলে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন? এবারেও অকপট স্বীকারোক্তি, 'ধুর, ক্ষেপেছেন? এই বয়সে আবার ওসব হয় নাকি? ওসব শিখতে গেলে নিজের কাজ করব কখন? লাইব্রেরিয়ানদের

সঙ্গে ভাব করেছি। লাইব্রেরিতে একজন প্রবাসী বাঙালি আছে। তার বাড়িও গেছি। দারুণ সম্পর্ক হয়ে গেছে। কী নিয়ে বলব, সেটা বললেই হল। এখান ওখান থেকে খুঁজে বের করে দেবে। ওরাও তো আমার ভাইয়ের মতোই। এত বছরের সংসদে আমিই একমাত্র এমপি যে লাইব্রেরিয়ানের বাড়ি গেছি। একেবারে পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে গেছে। হয়ত সেই কারণেই, লাইব্রেরির সবাই আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসে। এটা ওটা খুঁজে বের করে দেয়। তাই আমার কাজটা ঠিকঠাক করতে পারি।' তৃণমূলের এমপি দের জিজ্ঞেস করুন, লাইব্রেরিটা কোনদিকে। যাওয়া তো দূরের কথা, কজন বলতে পারবেন, সেটাই সন্দেহ।

ফাঁস করলেন আরও একটি গোপন কথা, 'প্রথম প্রথম স্পিকার বলতেই দিতেন না। ঠিক করলাম, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভাব করতেই হবে। শাড়ি, মিস্টি নিয়ে স্পিকার মীরা কুমারের বাড়ি চলে গেলাম। বললাম, বুড়ো বয়সে এম পি হয়েছি। আর হয়ত কোনওদিন হব না। বেশি কিছু তো চাইছি না। একটু বলতেও দেবেন না? কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি কিছুটা সদয় হলেন। এখন আমি বলতে চাইলেই উনি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেন। একটা দাদা—বোনের সম্পর্ক হয়ে গেছে।'

তাহলে সাংসদ হিসেবে আপনি বেশ সফল? বালুরঘাটের সাংসদ বছর পাঁচেক আগে বলেছিলন, 'আমাকে না জিজ্ঞেস করে এটা অন্য এম পি দের জিজ্ঞাসা করুন। তারা আরও ভাল বলতে পারবে। চেয়েছিলাম, সাংসদ হিসেবেও একটা ছাপ ফেলতে। অনেকটাই পেরেছি। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত থাকি। সবার কথা শুনি। রোজ কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করি। কখনও রাজ্যের সমস্যা, কখনও এলাকার সমস্যা তুলে ধরি। একেবারে সংসদ যখন ফাঁকা হয়ে যায়, একাই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরি। ফেরার সময় ফুটপাথ ধরে আমাকে হাঁটতে দেখে বিভিন্ন নেতা–মন্ত্রীরা গাড়িতে তুলে নেন। বাড়িতে পৌঁছে দেন। তবে বেশিরভাগ দিন হেঁটেই ফিরি। বাড়ি ফিরে রাত জেগে আবার পড়তে বসে যাই। এই পাঁচ বছরে এয়ারপোর্ট, স্টেশন, বাড়ি আর লোকসভার বাইরে দিল্লির কিছুই চিনি না।'

এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কতটা উদ্যোগী? একটা ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরা যাক। ২০১২ সালের কথা। এলাকায় একটি কলেজের উদ্যোগ নিলেন। ঠিক করলেন, নিজের সাংসদ তহবিল থেকেও টাকা দেবেন। কিন্তু নতুন সরকার যদি বাধা দেয়! খোদ তৃণমূল জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্রকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন রাইটার্সে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। দাবি করলেন, 'এলাকায়

কলেজ চাই, আমি টাকা দেব। কিন্তু আপনাদের সাহায্য চাই। সাহায্য করবেন কিনা বলুন। আমি সব সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এবার দেখি আপনারা কতটা উদার হতে পারেন।' কিন্তু আপনার দল তো এতে ক্ষুব্ধ হতে পারে! প্রশান্তবাবুর সাফ কথা, এলাকার সাংসদ হিসেবে আমি আমার এলাকায় কলেজ চাইতে পারি না? সেটা করতে গিয়ে যদি তৃণমূলের সাহায্য বা সরকারের সাহায্য দরকার হয়, আমি একশোবার সাহায্য চাইব। স্থানীয় স্তরে যেন বাধা না আসে, সেই কারণেই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানালাম। আর লুকিয়ে লুকিয়ে আবেদন করব কেন? প্রকাশ্যে রাইটার্সে গিয়েই দাবি জানালাম। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?'

এমন নানা মজার ঘটনা রয়ে গেছে এই মানুষটাকে ঘিরে। অনেকেই হয়ত জানেন না, দু দশকের বেশি সময় আরএসপি–র জেলা সম্পাদক থাকলেও মমতার লড়াইয়ের খুব অনুরাগীও ছিলেন। তৃণমূলের এম পি সংখ্যা তখন ১। মমতার প্রশংসা করার তেমন লোক পাওয়া যেত না। সেই সময়ও এমনভাবে মমতার হয়ে গলা ফাটাতেন, মনে হত তৃণমূলেও বোধ হয় মমতার এমন অনুরাগী নেই। একুশো জুলাই কলকাতায় থাকলে লুকিয়ে লুকিয়ে মমতার সভাতেও চলে গেছেন

বেশ কয়েকবার (আজ বলতে বাধা নেই, অন্তত দুবার সাক্ষী এবং সঙ্গী এই অধম)। মিশে যেতেন ভিড়ের মাঝে। দলের লোকেরাও জানতেন না। এমনকী, স্বয়ং মমতাও বোধ হয় জানতেন না, বাম শিবিরে তাঁর এতবড় অনুরাগী আছেন। মাঝে মাঝেই বলতেন, 'সব ব্যাপারে সমালোচনা করা উচিত নয়। মানুষ ভাল না বাসলে এত ভিড় কী এমনি এমনিই হয়! মেয়েটার মধ্যে লড়াই আছে। এটা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে। আমি প্রশংসা করি বলে অনেকে রেগে যায়। কে রাগল, আমার বয়েই গেল।' আবার এই মমতাই যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, মোহভঙ্গ হতে সময় লাগেনি। বলেছিলেন, 'মেয়েটা মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। ভাল কোনও বন্ধু নেই। কাউকে বিশ্বাস করে না। ভুলভাল লোকের পাল্লায় পড়েছে। ওরাই ওকে ডোবাবে।'

চেনা ছকের বাইরে। আর দশজনের থেকে একেবারেই আলাদা। ২০১৪ তে এই মানুষটাই নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালেন সংসদীয় রাজনীতি থেকে। রাগ নয়, দুঃখ নয়, এমনকী অভিমানও নয়। বললেন, আর নয়, ঢের হয়েছে। বয়স বাড়ছে। আর কী ছুটতে পারব? নিজের নাম তো নিজেই ডোবাবো। তার চেয়ে ফর্ম থাকতে থাকতে রিটায়ার করাই ভাল। লোকে মনে রাখবে।

সত্যিই কি লোকে মনে রাখল? তাঁর মৃত্যুতে এক লাইনের খবর ছাপতেও কত কার্পণ্য। কোনও চ্যানেলে এক লাইনের উল্লেখও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। মৃত্যু সংবাদ ছাপলে নিশ্চয় মমতা ব্যানার্জি রেগে যেতেন না। নিশ্চয় এর জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিতেন না। আসলে, সন্ত্রাসের অজুহাত খাড়া করে অনেক অজ্ঞতাও চাপা দেওয়া যায়। মাত্র পাঁচ বছর আগের সাংসদকে না চিনলে যা হয়, তাই হয়েছে। এই সীমাহীন অজ্ঞতা, সীমাহীন লজ্জা ঢাকব কীভাবে? আমরা মিমি, নুসরতের পোশাক, ডায়েট চার্ট, বয়ফ্রেন্ডের আলোচনায় মগ্ন থাকব। আমরা প্রশান্ত মজুমদারকে চিনি না। কারণ, তাঁকে চেনার যোগ্যতা আমাদের নেই।

(২ এপ্রিল, ২০১৯)

জোট না হওয়ায় আক্ষেপ করতেই হবে

এত উদ্যোগের পরেও জোট শেষমেষ ভেস্তেই গেল। দু পক্ষই অহেতুক জেদাজেদির রাস্তা নিলেন। কংগ্রেসের দিক থেকে যুক্তিহীন জেদটা একটু বেশি। কিন্তু বামেরাও আরেকটু ধৈর্য দেখালে পারতেন।

প্রথমত, জোট আলোচনা শুরুই হয়েছিল অনেক দেরিতে। সত্যিই যদি জোট করতে হত, তাহলে অনেক আগে থেকে সেই আলোচনা শুরু করা দরকার ছিল। কেন বারবার কথায় কথায় রাহুল গান্ধীকে হস্তক্ষেপ করতে হবে? কেন বারবার সীতারাম ইয়েচুরিকে জট ছাড়াতে হবে? দুই দলের শীর্ষনেতৃত্ব ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। এরপর সেই আলোচনা তো রাজ্যস্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই রফাসূত্র খুঁজতে বারবার তাঁরা ব্যর্থ হলেন। তাই বারবার জল গড়াল দিল্লিতে।

জোট হওয়া মানে কি শুধু বাম আর কংগ্রেসের ভোট যোগ হওয়া? ভোটের অঙ্কটা পার্টি গণিত নয়। এখানে দুই আর দুই মিলে অনেক সময় ছয় বা সাতও হতে পারে। অনেকে বলেন, কংগ্রেসের ভোট বামে আসে না। নাই বা এল। কিন্তু কং–বাম জোট হচ্ছে শুনলে, এমন অনেক ভোট এসে যেত যেগুলো হয়ত বাম বা কংগ্রেস কারও ভোট নয়। দেখা যাচ্ছে, গত লোকসভার ক্ষেত্রে বাম ও কং ভোট মিলে যতখানি ভোট, বিভিন্ন বিধানসভায় তার থেকেও বেশি ভোট পেয়েছেন বাম বা কং প্রার্থীরা। এটা কীভাবে হল? কারণ, লোকসভায় যাঁরা বাম বা কংগ্রেসকে দেননি, তাঁরাই জোট হওয়ার পর ভরসা রেখেছেন।

জোট হলে কংগ্রেস হয়ত একটু বেশি আসন পেত। হয়ত বামেদের থেকে বেশিই পেত। হয়ত দেখা গেল, কংগ্রেস পাঁচটি আসনে, বামেরা তিনটি আসনে জিতল। অন্তত এই আটটি আসনে তৃণমূলকে তো হারানো যেত। অন্তত তিরিশ আসনে দ্বিতীয় তো থাকা যেত। শূন্য হওয়ার থেকে তো তিন পাওয়া ভাল। অনেক কেন্দ্রেই লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি হত। যা ভেস্তে গেল জোট না হওয়ায়। তার চেয়েও বড় বিপদ অন্য জায়গায়। জোট না হওয়ায় অধিকাংশ

আসনেই দ্বিতীয় শক্তি উঠে আসবে বিজেপি। বাম বা কংগ্রেস এককভাবে লড়ে অধিকাংশ জায়গাতে তৃতীয় বা চতুর্থ হবে। আগামীদিনে জোট করতে চাইলেও বিরোধী পরিসর চলে যাবে বিজেপির দখলে। তখন 'আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে' বলা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না।

আবার বলব, দায়ী মূলত কংগ্রেস। নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা না বুঝেই তারা আসন চাইতে লাগল। কিন্তু বামেরাও আরেকটু ধৈর্য দেখাতে পারতেন। কথাবার্তা আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতেই পারতেন। যা হল, তাতে শুধু তৃণমূলেরই সুবিধা হল। বিজেপির সুবিধা হল আরও বেশি। আরও কয়েকটা আসন তাদের উপহার দেওয়া হল। এর জন্য একদিন আক্ষেপ করতে হবে।

(৩ এপ্রিল, ২০১৯)

মিমি–নুসরতদের ক্ষমা করে দিন

ধরা যাক, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্সের শিক্ষক নেওয়া হবে। যদি ইন্দ্রাণী হালদার বা সোহমকে নেওয়া হয়, কেমন হবে? ওঁরা বলতেই পারেন, ছাত্রদের জন্য কাজ করতে চাই। তাই, প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনা করতে চাই।

ধরা যাক, বাংলা রনজি দলে বা কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে একজন অলরাউন্ডার দরকার। কাকে নেওয়া যায়? ধরা যাক, কবি জয় গোস্বামী বা পরিচালক অরিন্দম শীলকে নেওয়া হল। কেমন হবে? ওঁরা তো বলতেই পারেন, আমি বাংলাকে ভালবাসি। বাংলাকে জেতাতে চাই।

ধরা যাক, আপনার কোনও নিকট আত্মীয় বা বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন। সিরিয়াস একটা অপারেশন করতে হবে। অমনি আপনি দেখলেন, ডাক্তারের পোশাক পরে দেবশ্রী রায় বা তাপস পাল আসছেন। কেমন

হবে? ওঁরা তো বলতেই পারেন, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। তাই এই অপারেশন আমিই করব।

নিশ্চয় আপনি মনে মনে ভাবছেন, ফাজলামি হচ্ছে? যাকে তাকে প্রেসিডেন্সিতে পাঠিয়ে দিলেই হল! যাকে তাকে বাংলার হয়ে ইডেনে নামিয়ে দিলেই হল! যাকে তাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিলেই হল!

কেন মশাই, অসুবিধা কী আছে? দেবশ্রী রায় অপারেশন করতে পারবেন না? জয় গোস্বামী ক্রিকেট খেলতে পারবেন না? নাকি ইন্দ্রাণী হালার প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্সের ক্লাস নিতে পারবেন না? নিশ্চয় পারবেন। যাঁর 'অনুপ্রেরণা'য় এই রাজ্যে সবকিছু হয়, তিনি চাইলে নিশ্চয় পারবেন।

আর এঁরা যদি ফিজিক্স পড়াতে পারেন, অপারেশন করতে পারেন, ক্রিকেট খেলতে পারেন, তাহলে মিমি–নুসরতরাও পার্লামেন্টে যেতে পারবেন। আসলে, যে কোনও জায়গায় কাজ করতে গেলে, সেই কাজটা শিখে আসতে হয়। শুধু রাজনীতি করতে গেলে কিছু শেখার দরকার নেই, কিছু জানার দরকার নেই। যাঁকে খুশি নামিয়ে দিলেই হল। স্কুল–কলেজে

নাকি যাকে-তাকে নেওয়া যায় না। কিন্তু পার্লামেন্টে যাকে খুশি পাঠানোই যায়। হ্যাঁ, পার্লামেন্টকে এতটাই সস্তা মনে করেন তৃণমূল নেত্রী।

মুনমুন সেন বা সন্ধ্যা রায় পাঁচ বছর সাংসদ ছিলেন। কী কাজ করেছেন, সেই প্রশ্ন না হয় নাই বা করলেন। কারণ, একজন এমপি-র কী কাজ, সেটা তাঁরা বুঝে উঠতেই পারলেন না। জিজ্ঞেস করুন তো, বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর লোকসভার মধ্যে কোন কোন বিধানসভা পড়ে? নিশ্চিতভাবেই হোঁচট খাবেন। একটা বিধানসভার কতটা আয়তন, সে সম্পর্কে এঁদের ন্যূনতম ধারনাটুকুও নেই। আগেও ছিল না। এম পি হওয়ার পরেও ন্যূনতম শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেননি। হ্যাঁ, যিনি নিজের সাতটা কেন্দ্রের নাম জানেন না, তাঁর ডিগ্রি যতই থাক, তাঁকে মূর্খ ছাড়া কী বলবেন?

সুতরাং, দোষটা মিমি বা নুসরতের নয়। লোকসভার গুরুত্ব কী, তাঁরা না জানতেই পারেন। কিন্তু যিনি তাঁদের লোকসভায় পাঠাতে চাইছেন, তিনি বোঝেন তো? একটা গল্প আছে। একটি গ্রামে একটি অনুষ্ঠান। বাইরে থেকে কোনও এক শিল্পী এসে গেয়েই যাচ্ছেন। থামার কোনও লক্ষণ নেই। এদিকে, দর্শকরা

একে একে সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছেন। গায়ক তবু গেয়েই চলেছেন। দেখা গেল, একজন লাঠি হাতে মঞ্চের সামনে এসে কাকে যেন খুঁজছেন। এবার গায়ক ভয় পেয়ে গেলেন। গান থামিয়ে দিলেন। তখন লাঠি হাতে সেই ভদ্রলোক আশ্বস্ত করে বললেন, ‘ আরে, আপনি থামলেন কেন? আপনি গ্রামের অতিথি। আমি আপনাকে কিছু করব না। আমি তাকে খুঁজছি, যে আপনাকে এনেছে।’

তাই মিমি–নুসরতদের ওপর রাগ না দেখানোই ভাল। যাঁরা তাঁদের লোকসভায় পাঠাতে চাইছেন, তাঁদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার সময় এসে গেছে। লোকসভায় জঙ্গিহানা যতটা নিন্দনীয়, এইসব অর্বাচীনদের পাঠানোও ততটাই অপরাধ। লোকসভা ছ্যাবলামি করার জায়গা নয়, এটা অন্তত বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

(৪ এপ্রিল, ২০১৯)

পলাতক গুরুংকেও এত ভয় কেন?

বিমল গুরুংকে আটকানোর কী মরিয়া চেষ্টা! সকাল থেকেই পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। নামলেই নাকি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। ওদিকে, পাহাড়ে লেলিয়ে দেওয়া হল আরেক বাহিনীকে। গুরুং পাহাড়ে উঠতে চাইলে তাঁরা নাকি কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন। আরেক বাহিনীকে পাঠানো হল জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে। গুরুং যেন কোনওভাবেই জামিন না পান, তা নিশ্চিত করতে হবে।

যে মানুষটা দেড় বছর ধরে পাহাড়ে নেই, এমনকী রাজ্যেও নেই, তাঁকে আটকানোর এমন মরিয়া চেষ্টা? যেসব মামলা বিমল গুরুংয়ের নামে আছে, সেই একই মামলা দেওয়া হয়েছিল বিনয় তামাংয়ের নামেও। অথচ, যেই দিদিমণির কাছে নতজানু হলেন, অমনি তিনি হয়ে গেলেন সরকারের খাস লোক। নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাঁকে বানিয়ে দেওয়া হল

জিটিএ-র প্রধান। মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও আরও দুবার মেয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ, নেত্রীর কথায় তাল মেলালেই সব মামলা থেকে অব্যবহতি।

গত দেড় বছর ধরে প্রচার চালানো হচ্ছে, পাহাড়ে গুরুংয়ের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। মোর্চার পুরোটাই নাকি বিনয় তামাংদের হাতে চলে এসেছে। পাহাড়ের মানুষ নাকি বিনয় তামাংদের সঙ্গে। তাহলে, গুরুংকে এত ভয় কেন? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, আগামী চারদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তারপরেও বিমান বন্দরে এত পুলিশের মোতায়েন কেন? এটা কি সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা নয়? আদালতে জামিন আটকাতে এত তৎপরতা কেন?

আসলে, সরকার যখন অহেতুক ভয় পেতে শুরু করে, তখন এরকমই হয়। সুতোকেই সে সাপ ভেবে বসে। প্রশাসন ও পুলিশের হয়েছে সেই দশা। বোঝাই যাচ্ছে, পাহাড়বাসীর ওপর গুরুংয়ের প্রভাব এখনও যথেষ্টই। বিনয় তামাং সাজানো পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। গত দেড় বছরে না বিজেপি, না গুরুং বাহিনী, কেউই বড়সড় কোনও মিটিং করতে পারেনি। তারপরেও যদি তারা জিতে যায়, সেটা সত্যিই সরকারের

লজ্জা। আরও একটা মোক্ষম থাপ্পড় হয়ত অপেক্ষা করছে। পাহাড় হাসছে বলে যতই প্রচারের ঢক্কা নিনাদ থাকুক, সেই পাহাড় যে গর্জে উঠতেও জানে, সেই পাহাড় যে নির্লজ্জ তাঁবেদারদের সঙ্গে থাকে না, ২৩ মে হয়ত এমন বার্তা উঠে আসতে পারে।

(৫ এপ্রিল, ২০১৯)

এভাবে কেউ নিজের ব্যর্থতার বিজ্ঞাপন করে!

পাঁচ বছর পর সিবিআই বুঝল, রাজীব কুমার তদন্তে সহযোগিতা করেননি? পাঁচ বছরেও অর্ণব ঘোষকে জেরা করা গেল না? পাঁচ বছর পরে সিবিআই বুঝল, রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছে না? পাঁচ বছর পর বোঝা গেল, অনেক তথ্য-প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে? পাঁচ বছর পরে বুঝল, আরও অনেক প্রভাবশালী যুক্ত আছেন?

আমার তো মনে হয়, অপরাধীদের আগে এই অপদার্থ সিবিআই কর্তাদেরই জেলে ভরা উচিত। সিবিআই কি নিজের ইচ্ছেয় তদন্তের গতি শ্লথ করে দিয়েছে? মোটেই না। ওপর থেকে বিশেষ নির্দেশ ছাড়া এভাবে শীতঘুমে যাওয়া যায় না। কে বা কারা সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন? মোদিবাবুর ক্ষমতা আছে খুঁজে বের করার?

তৃণমূল নেত্রী মাঝে মাঝেই বলেন, তদন্তের পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে। একেবারেই ঠিক বলেন। রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে বলেই আসল অপরাধীরা এখনও অক্ষত আছে। রাজনৈতিক বোঝাপড়া আছে বলেই পাঁচ বছর ধরে সিবিআই ঘুমিয়ে থাকে।

যাঁরা অপরাধী, তাঁরা তদন্ত প্রভাবিত করতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তাঁরা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করতে চাইবেন, তদন্তে বাধা দিতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা তদন্তের দায়িত্বে, তাঁদের ভূমিকাটা কী? তাঁরা কি আন্তরিকভাবে তদন্ত করতে চেয়েছেন? সেই সিবিআইকে যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা কি চান সত্যিকারের তদন্ত হোক! তাহলে, মুকুল রায়ের হাতে টিকিট বিলির দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন না। তাহলে, শোভন চ্যাটার্জিকে দলে নেওয়ার জন্য এমন মরিয়া চেষ্টা চালাতেন না। তদন্তের নামে লোকদেখানো কিছু ধরপাকড়, একটু চাপে রাখা। আসলে, সরকার গঠনে সংখ্যা কম পড়লে আবার তাদেরই লাগবে। তাই দরজাটা খুলে রাখা।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নারদার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। আড়াই বছর আগের ঘটনা। বিরোধীদের চাপে লোকসভার এথিক্স

কমিটি তৈরি হয়। ধিক্কার জানাই সেই লোকসভাকে যাঁরা আড়াই বছরে এথিক্স কমিটির একটা মিটিং ডাকতে পারল না। এই অপদার্থতার দায় কার?

এরপরেও এই রাজ্যের অনেকে ভাবছেন, বিজেপি নাকি তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। বিজেপি নাকি সারদা তদন্ত করবে। হায় রে! যাঁরা পাঁচ দিনের কাজটা পাঁচ বছরেও করতে পারল না, তাঁদের কাছে এরপরেও কেউ প্রত্যাশা রাখে! প্রধানমন্ত্রীকে দেখেও অবাক লাগছে। পাঁচ বছরের এমন ডাঁহা ব্যর্থতা। এরপরেও কেউ এভাবে নিজের ব্যর্থতার বিজ্ঞাপন করে?

(৮ এপ্রিল, ২০১৯)

এবার সার্কিট বেঞ্চও কি লেজুড়বৃত্তিতে নাম লেখাবে!

হয় বিমল গুরুংয়ে জামিন হত অথবা খারিজ হত। হয় তাঁকে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হত অথবা হত না। তার বদলে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হল। তার আগেই পাহাড়ের ভোট হয়ে যাচ্ছে। এই ঝুলিয়ে রাখাটাই অনেক প্রশ্ন তুলে দিল। নিরপেক্ষতার প্রশ্নে শুরু থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল সার্কিট বেঞ্চ। লিখেছেন অলক ভট্টাচার্য।

খুব ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল সার্কিট বেঞ্চের। একবার নয়, দু'দুবার। একবার উদ্বোধন করে গেলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ হল না। তাঁর রাজ্যে সার্কিট বেঞ্চ। তিনি এতবার তদারকি করলেন। শেষে কিনা নেপোয় এসে দই মেরে যাবে! অতএব, তাঁর অনুপ্রেরণায় আরও একবার উদ্বোধন। প্রথম উদ্বোধনের পেছনে সস্তা রাজনীতি ছিল। দ্বিতীয়টাও কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু নয়। সেটাও পাল্টা সস্তা রাজনীতি। কী আশ্চর্য,

দ্বিতীয়বার উদ্বোধনে হাজির হয়ে গেলেন বিচারপতিরাও। তাঁরাও দড়ি টানাটানির অংশ হয়ে গেলেন।

কোনও সন্দেহ নেই, এই সার্কিট বেঞ্চ হওয়ায় উত্তরবঙ্গের মানুষের অনেকটাই সুবিধা হল। কথায় কথায় আর কলকাতা ছুটতে হবে না। এ নিয়ে কোনও মহলেই দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু সার্কিট বেঞ্চকেও বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে হবে। এখন তাঁরা সরকারের কাছে বিশ্বস্ত হবেন নাকি জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত হবেন, সেটা তাঁরাই ঠিক করুন।

সার্কিট বেঞ্চের সামনে প্রথম বড়সড় পরীক্ষা ছিল বিমল গুরুংয়ের জামিনকে ঘিরে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, তাঁকে আগামী চারদিন গ্রেপ্তার করা যাবে না। কিন্তু অন্য মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে মরিয়া রাজ্য প্রশাসন। তিনি আসবেন শুনেই ঘিরে ফেলা হল বিমানবন্দর। তিনি সার্কিট বেঞ্চে আসতে পারেন শুনে পুলিশের সব কর্তা হাজির হয়ে গেলেন সার্কিট বেঞ্চে। গুরুং আসতে পারেননি। তাঁর আইনজীবীর আবেদন কী ছিল? দার্জিলিংয়ে লোকসভার ভোট। অন্তত ভোট পর্যন্ত প্রচার করার সুযোগ দেওয়া হোক। তারপর যেমন বিচার প্রক্রিয়া চলছে, চলুক।

বিমল গুরুংয়ের নামে যা যা মামলা, তার অধিকাংশ মামলাই দেওয়া হয়েছিল বিনয় তামাংয়ের নামেও। বিনয় তামাং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করছেন, তৃণমূলের হয়ে দিব্যি প্রচার করছেন, সব আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন জিটিএ–র শীর্ষে বসে গেছেন। অথচ, গুরুংকে ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। বিমল গুরুং যদি অপরাধী হয়ে থাকেন, তাহলে বিনয় তামাংও তাই। দুজনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দুরকম আচরণ করছে। এটা কি বিচারপতিদের অজানা?

গুরুংয়ের আগাম জামিন বিচারপতিরা খারিজ করতেই পারতেন। কিন্তু তাঁরা কী করলেন? তাঁরা বললেন, এখন এই মামলা শোনা যাবে না। ২২ এপ্রিলের পর শুনানি হবে। কিন্তু ততদিনে তো পাহাড়ে ভোট হয়ে যাবে। তিনি চেয়েছিলেন, ভোটের আগে পাহাড়ে প্রচার করতে। বিনয় তামাং–অনীত থাপারা যদি প্রচার করতে পারেন, তাহলে গুরুং পারবেন না কেন? অথচ বিচারপতিরা জানালেন, মামলা শুনবেন ২২ এপ্রিল। অর্থাৎ, ভোটের পর। ভোট হয়ে যাওয়ার পর তিনি প্রচার করবেন?

বিচারপতিদের প্রতি সম্মান রেখেও এই সিদ্ধান্ত অনেক প্রশ্ন

তুলে দিল। যাঁরা হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে বিমানবন্দর ঘিরে ফেলল, স্বয়ং এসপি হাজির হয়ে গেলেন সার্কিট বেঞ্চে। তাঁরা বিচারপতিদের ওপর কোনও প্রভাব তৈরির চেষ্টা করেননি, এটা বিশ্বাসযোগ্য? আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়ে সচরাচর প্রশ্ন তোলা হয় না। কিন্তু আদালত নিজেই যদি প্রশ্ন তোলার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে তার ভাবমূর্তি কে রক্ষা করবে?

আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। হয় জামিন হত অথবা খারিজ হত। এটাকে অহেতুক ঝুলিয়ে রাখার কোনও যুক্তি নেই। এই ঝুলিয়ে রাখাটাই অনেক প্রশ্ন তুলে দিল। নিরপেক্ষতার প্রশ্নে শুরু থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল সার্কিট বেঞ্চ।

(৭ এপ্রিল, ২০১৯)

এমন স্বীকারোক্তির পরেও ‘সততার প্রতীক’ বলবেন না?

যাক, এতদিনে তিনি তাহলে সত্যি কথা বললেন। ঘনিষ্ঠ মহলে নয়, একেবারে জনসভা থেকে। মৃদু স্বরে নয়, বেশ চড়া স্বরে। টিভিতে লাইভ টেলিকাস্টের দৌলতে দেখল সবাই।

তাঁর অভিযোগ, সারদা কাণ্ডের আসল পান্ডা মোদির মঞ্চেই বসে আছেন। তিনিই সভা পরিচালনা করছেন। নাম করেননি, কিন্তু ইঙ্গিতটা কার দিকে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও বলতে পারবে। যাঁর দিকে ইঙ্গিত, তিনিও কয়েক ঘন্টা পরেই ঘটা করে প্রেস কনফারেন্স করে ফেললেন। অর্থাৎ, তিনি ঠিক বুঝলেন, ইঙ্গিতটা তাঁর দিকেই। তাহলে আর জল্পনার বাকি কী রইল!

এতদিন জোর গলায় একজন দাবি করতেন, সারদায় তৃণমূলের কেউ যুক্ত নয়। তৃণমূলের কেউ টাকা নেয়নি। আজ সেই তিনিই বলছেন, সারদার আসল পান্ডা বিজেপির মঞ্চে বসে আছেন। অহরহ মিথ্যের এই এক মুশকিল। কখন যে মুখ ফস্কে সত্যিটা

বেরিয়ে যায়! কারও কারও ক্ষেত্রে খুঁজতে হয়, সারা জীবনে তিনি কী কী মিথ্যে বলেছেন। কারও ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা। মিথ্যে বলাটা এমনই এক দৈনন্দিন অভ্যেস যে, সত্যি বললেই লোকে চমকে যায়। যদি বলা যায়, এই বছরে তিনি কটি সত্যি বলেছেন? নিঃসন্দেহে একেবারে সামনের সারিতেই থাকবে এই স্বীকারোক্তিটি। সত্যের ক্ষমতা সত্যিই অসীম। মিথ্যের জঞ্জাল থেকে সে ঠিক উকি মারে।

তাঁর কথা অনুযায়ী, সরদার আসল পান্ডা নাকি বিজেপির মঞ্চে বসে থাকা লোকটি। গাছ থেকে আম পড়ার পর তা কোন ঝুড়িতে আছে, সে সবাই জানে। কিন্তু এই আমের মুকুলটি যেন কোন গাছে ছিল? কোন গাছে সে ফলেছে? যে 'গদ্দার' এর কথা বলা হচ্ছে, ২০১৭ পর্যন্ত তিনি 'অনুপ্রেরণা'র বৃত্তেই ছিলেন। নিশ্চয় সারদা কেলেঙ্কারিটা ২০১৮ বা ২০১৯ সালের ঘটনা নয়। তাহলে, যখনকার ঘটনা, তখন তিনি কোথায় ছিলেন? তখন তাঁর মাথার ওপর কার হাত ছিল? আসল পান্ডাকে চিনতে এত দেরি?

গোটা রাজ্যের লোক জানত, আসল পান্ডা কে? ঠিক তেমনি গোটা রাজ্যের লোক জানে, কার অনুপ্রেরণায় এইসব কান্ড

হয়েছিল। কে তাঁকে এত বছর ধরে আড়াল করেছিলেন। কেন পাঁচ বছর ধরে তদন্ত কার্যত ধামাচাপা রইল? তদন্তের কথা উঠলেই কে সবথেকে বেশি গর্জে উঠেছেন? কার দিক থেকে সবথেকে বেশি বাধা এসেছে?

এসব বেয়াড়া প্রশ্ন থাক। ফেসবুকে কটাক্ষের ঝড় উঠবে। দুটো পাশাপাশি ভিডিও ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু একটা ধন্যবাদ অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর প্রাপ্য। অবশেষে তিনি সত্যি বলেছেন, যা তিনি কদাচিৎ বলে থাকেন। লক্ষ লক্ষ ঝিনুকের মাঝে একটি মুক্তো থাকে বলেই সে এত মহার্ঘ্য। ঠিক তেমনি, লক্ষ লক্ষ মিথ্যের মাঝে একটি মূল্যবান সত্যি। এর মূল্য কিন্তু কম নয়। অন্তত এক জন্য তাঁকে একটা অভিনন্দন জানানোই যায়।

(৮ এপ্রিল, ২০১৯)

ভবিষ্যতের ভূত দুটি একটি কথা

বর্তমানের ভূত তো প্রায় রোজ দেখছি। ‘ভবিষ্যতের ভূত’ও দেখে এলাম। এতদিন পরে ফিল্ম রিভিউ লেখার কোনও মানে হয় না। তবে, বেঙ্গল টাইমসের পাঠকদের জন্য নিজের কিছু অনুভূতি মেলে ধরছি।

১) প্রথমেই বলি, এই ছবি বানাতে সাহস লাগে। খুব উচ্চ মার্গের ছবি, এমন নয়। কয়েক বছর পর এই ছবি দেখলে হয়ত প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। যাঁরা রাজনীতির খুঁটিনাটি খবর রাখেন, তাঁরাই সংলাপগুলোর মর্ম বুঝবেন। বাকিদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

২) দ্বিতীয়ার্ধটা বেশ বোরিং। অকারণে বাড়ানো হয়েছে। একটু কাটছাঁট করলে ভাল হত।

৩) নাম উল্লেখ করা হয়নি ঠিকই, তবে কোন কটাক্ষটা কার জন্য, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এমন সময় এরকম ছবি বানাতে সাহস লাগে বইকি।

৪) হল এত ফাঁকা কেন? কদিন আগেই তো এই ছবিকে ঘিরে আন্দোলনের তুফান উঠেছিল। সোশ্যাল সাইটে এত প্রতিবাদ। হল ভরানোর ক্ষেত্রে কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না! যাঁরা মনে করছেন, এই ছবি আটকানো ভুল হয়েছিল, তাঁরা তো প্রতিবাদেও ছবিটা দেখতে পারতেন।

৫) প্রতিবাদ একেকজন একেক ভাবে করেন। সবাই অনীক দত্ত নন। এই আবহে এতখানি সাহস দেখানো সহজ কথা নয়। আমরা অনীক দত্তর মতো ছবি বানাতে পারি না। কিন্তু তাঁর এই সাহস ও মেরুদণ্ডকে কুর্নিশ তো করতে পারি।

৬) শাসকের জন্যও বার্তা আছে। ছবির বিষয়টাই যথেষ্ট বার্তাবহ। কোথায় কী কী অনাচার, অবিচার চলছে। অনুপ্রেরণার নামে কীভাবে মস্তানি, তোলাবাজি চলছে, তা দেখে তাঁরা কি শিক্ষা নেবেন?

৭) ছবির প্রদর্শন আটকাতে গিয়ে তাঁরা কত বড় ভুল করেছেন, এবার বুঝতে পারছেন! ছবি হলে চলছে, অথচ কেউ দেখছে না, এটাই তো শাসকের কাছে স্বস্তির কারণ হতে পারত। তার বদলে ছবিটাকে আটকে দিয়ে অতিরিক্ত প্রচার দেওয়া হয়ে গেল। হল খালি দেখে শাসক দলের কর্তাদের নিশ্চয় আনন্দই পাওয়া উচিত।

৮) মিডিয়া। আবার ছবিটি হলে এল। অথচ, তাকে ঘিরে সবাই কী নিরুত্তাপ। অনেকে জানতেই পারলেন না ছবিটি আবার দেখানো হচ্ছে। জানতে পারলে নিশ্চিতভাবেই আরও অনেকে ভিড় জমাতেন।

৯) যাঁরা নির্মাতা, তাঁরাও সেভাবে প্রচার করতে পারেননি। ছবিটি যে হলে আনা হয়েছে, সেটি আবার প্রচার করার দায়িত্ব কার?

১০) পরিচালক ও প্রযোজককে ধন্যবাদ। তাঁরা এরকম একটা সাহসী ছবি বানানোর কথা ভেবেছেন। সরকার রেগে যাবে ভেবেও পিছিয়ে যাননি। এমনকী, হল থেকে তুলে নেওয়ার পরেও ভেঙে পড়েননি। অভিনন্দন সেই লড়াকু কলাকুশলীদের,

যাঁরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। অভিনন্দন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অপর্ণা সেনকেও। দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে রেখে তাঁরাও রাস্তায় নেমেছেন। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এই সাহস দেখানোটাও খুব সহজ ছিল না।

(৮ এপ্রিল, ২০১৯)

শুল্ক দপ্তর দায়ী হলে বিচার বিভাগ কেন নয়?

কোনও এক পিসির কোনও এক ভাইপোর একমাত্র স্ত্রী। অভিযোগ, তিনি ব্যাঙ্কক থেকে ফেরার সময় তাঁর ব্যাগে অনেক আপত্তিকর জিনিস ছিল। অভিযোগ, শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর ব্যাগ দেখতে চাইলে তিনি দেখাতে অস্বীকার করেন। অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ গিয়ে শুল্ক দপ্তরের কর্তাদের হুমকি দেন। এবং ভাইপোর স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুরুতে ব্যাপারটা ততটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ভোটের আগে এমন কত কথাই তো উড়ে বেড়ায়। না প্রিন্ট না ইলেকট্রনিক, কোনও মিডিয়াতেই বিষয়টা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। কিন্তু জনৈক ভাইপো সাংবাদিক সম্মেলনে কার্যত মেনেই নিলেন, কিছু একটা হয়েছিল। ভাইপোকে খুশি করতে কাগজেও ছাপতে হল। টিভিতেও দেখাতে হল। যাঁরা

জানতেন না, তাঁরাও জেনে গেলেন।

সুজন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দেওয়া হল। উকিলের চিঠি পাঠানো হল। সুজনও পাল্টা বললেন, 'হ্যাঁ, মামলা করুন। কোর্টেই ফয়সালা হবে।' জানাই ছিল, ভাইপো মামলা করার সৎসাহস দেখাবেন না। সেটাই হল। শুল্ক দপ্তর বিলম্বিত এফআইআর করল। সেই মহিলাও অভিযোগ জানালেন, তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। আদালত প্রথমে বলল, শুল্ক দপ্তরের সামনে হাজিরা দিতে হবে। যাওয়া হল ডিভিশন বেঞ্চে। তাঁরা জানালেন, আগামী তিন মাস হাজিরা দিতে হবে না। ২৬ জুলাই হাজির হলেই হবে।

এই রায় নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠতেই পারে। একদিকে বিচারপতিরা শুল্ক দপ্তরের কাছে জানতে চাইলেন, ঘটনার সাতদিন পর এফ আই আর করা হল কেন? নায্য প্রশ্ন। সত্যিই তো, শুল্ক দপ্তর সাতদিন দেরি করল কেন? কিন্তু এরপরই পাল্টা প্রশ্ন তোলা যায়, তাহলে বিচারপতিরা হাজিরা তিন মাস পিছিয়ে দিলেন কেন? দেরিতে হলেও শুল্ক দপ্তর যে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, আদালত তাকে পিছিয়ে দিল কেন? এই তিনমাসে অনেক প্রমাণ লোপাট করা সম্ভব, এই তিন মাসে অনেক

ফাকফোকর ভরাট করা সম্ভব। এই তিনমাসে মানুষের স্মৃতি থেকে বিষয়টা হারিয়েও যাবে। তারিখ পে তারিখ চলতেই থাকবে। আদালত কি সেই সুযোগটাই করে দিলেন না?

পুলিশ অনেক আগেই আস্থা হারিয়েছে। মূলস্রোত মিডিয়াও প্রতিদিন নিজেদের হাস্যকর করে তুলছে। তাঁদের প্রতিও সচেতন নাগরিকদের তেমন আস্থা নেই। যাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে এত আপত্তি কীসের? যিনি অভিযুক্ত, তিনি হাজিরা এড়াতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আদালত কেন এই দাবিতে সিলমোহর দিল? ভোটের আগে শাসক দল বিপাকে পড়ুক, এমনটা শাসক দল বা প্রশাসন চাইবে না, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু আদালত যখন এমন গুরুতর অভিযোগের পরও তিন মাস বিলম্বিত করতে চাইল, তখন নানা প্রশ্ন উঠবেই। বিচারপতিরা কি চাইছেন, তাঁদেরও মানুষ যেন অবিশ্বাস করতে শুরু করে! কেউ কেউ বলতেই পারেন, প্রভাবশালীদের প্রভাব হয়ত বিচার বিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন প্রশ্ন যদি উঠে থাকে, তবে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিরাই সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন।

(৯ এপ্রিল, ২০১৯)

এই ভাষা মুখ্যমন্ত্রীকে মানায়!

কুকথার বিরাম নেই। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী, কেউই যেন পিছিয়ে নেই। আসলে, নিজেদের পদের মর্যাদা না বুঝলে যা হয়! প্রতিদিন নিয়ম করে নিজেদের পদকে কলঙ্কিত করছেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভাবতেও অবাক লাগে, একজন মুখ্যমন্ত্রী দিনের পর দিন এভাবে নোঙরামো করতে পারেন! দিনের পর দিন এভাবে মিথ্যের বেসাতি করতে পারেন! এই ভাষা একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে রোজ বেরিয়ে আসে! জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের মুখে এই ভাষা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেন! বামপন্থীদের কথা ছেড়ে দিন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রফুল্ল সেনরা কখনও এই ভাষায় কথা বলেছেন?

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক লড়াই থাকতেই পারে। নানা রাজনৈতিক আক্রমণ করতেই পারেন। নিজের

সরকারের সাফল্য তুলে ধরতেই পারেন। কেন্দ্রের ব্যর্থতাও তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু একেবারে নিম্নস্তরের কুরুচিকর আক্রমণ করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি একবারও ভেবে দেখছেন না, এই আক্রমণ তাঁর দিকেও ধেয়ে আসতে পারে।

কখনও বলছেন, ঢুকিয়ে দেব। যাঁরা ভাষণটা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন। কখনও বলছেন, তুমি সংসারের কী বোঝো? নিজের বউকে দেখেছো? নিজের বউয়ের খোঁজ রেখেছো? এসবের সঙ্গে নির্বাচনের তেমন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এসব আক্রমণ করাটা অবশ্যই নিম্নরুচির কাজ। মোদি তো তবু বিয়ের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু কেউ কেউ তো স্বীকার করতেও চান না।

মোদির বিবাহ নিয়ে চায়ের দোকানে তর্ক হতেই পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় টিপ্পনীও হতে পারে। তাই বলে, একজন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভা থেকে এভাবে আক্রমণ করবেন? একই প্রশ্ন তো তাঁর দিকেও ধেয়ে আসতে পারে। সে কথা কি তিনি একবারও ভেবে দেখেননি? যদি বিজেপির কোনও অত্যুৎসাহী নেতাকর্মী সংযম হারিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলে বসেন,

তখন তাঁর বাড়িতে হয়ত পুলিশ যাবে। তখন বলা হবে, কুরুচিকর পোস্ট। কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যে এভাবে কুরুচিককর প্রচার করে চলেছেন, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না।

তাঁর কলতলার ঝগড়া, তাঁর কুরুচিকর প্রচার হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবাদ। অন্যের নায্য প্রশ্ন হয়ে ওঠে কুৎসা। এটাই এখন এই রাজ্যের দস্তুর।

(১০ এপ্রিল, ২০১৯)

আগে ভরসার যোগ্য হয়ে উঠুন

বিভিন্ন জেলায় যেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ। ভোটকর্মীরা জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে ভোট করতে যাওয়া সম্ভব নয়। একটি দুটি জেলায় শুরু হয়েছিল এই প্রতিবাদ। এখন উত্তরবঙ্গ–দক্ষিণবঙ্গ মিলেমিশে একাকার। প্রায় সব জেলাতেই ভোটকর্মীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা ঘটনা, সংবাদ শিরোনামে এই বিক্ষোভের কথা সেভাবে উঠে আসছে না। কেন আসছে না, সেটাও সহজেই বোঝা যায়।

অনেকে ভাবতে পারেন, এটা বোধ হয় কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদ। কিন্তু গত কয়েকদিন দেখলাম, এটি আর কোনও দলের এজেন্ডা নয়। এমনকী যাঁরা তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাও চাইছেন না এই অবস্থায়

ভোটে যেতে। তাঁদেরও বাড়িতে বাবা–মা আছেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আছে। কর্মক্ষেত্রে আমাদের সবাইকেই কিছু না কিছু আপোস করতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও অনেককেই তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনে বা সরকারি কর্মচারি সংগঠনে যোগ দিতে হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সূত্রে বেশ বুঝতে পারি, এটা ওঁদের বাধ্যবাধকতা। কিছু কিছু স্কুলের এমনই করুণ পরিস্থিতি যে, আপনি তৃণমূলের ঝান্ডা না ধরলে চাকরি করাই কঠিন। তাঁদেরও পঞ্চায়েত ভোটের ডিউটিতে যেতে হয়েছে। কেমন ভোট হয়েছে, সবাই নিজের চোখেই দেখেছেন। বাড়িতে এসে হয়ত বলেওছেন। সরকার বা প্রশাসন যতই নিজেদের ঢাক বাজান, ভোটের আসল ছবিটা কেমন, এই পরিবারগুলিও জানে।

তাঁরা হয়ত সামনে থেকে আন্দোলন করতে পারছেন না। কিন্তু তাঁরাও ভোটকর্মীদের এই দাবিকে সমর্থন করেন। প্রশাসন এখনও স্পষ্ট করে জানাতে পারছে না কী পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেই সব বুথে ঠিকঠাক ভোট হবে, এমনটাও মনে করি না। তবু একটা ভরসার জায়গা থাকবে। যেখানে সেখানে লেঠেল বাহিনীরা ঢুকে

পড়তে পারবে না। ভোটদাতারা একটু হলেও স্বস্তি পাবেন। মানছি, সারা দেশে ভোট হচ্ছে। চাইলেও সব বুথে হয়ত বাহিনী দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারের আদৌ সদিচ্ছা আছে তো? সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন। রাজ্য সরকারের হাতে এই ভোটের ভার ছেড়ে দিলে নিশ্চিত থাকুন, সব বুথেই সিভিক ভলান্টিয়ার আর হোমগার্ড দিয়ে ভোট করিয়ে নিত। আসলে, সরকার নিজেই যখন অবাধ ছাপ্পা চায়, তখন গণতন্ত্র এভাবেই ধর্ষিত হয়।

ক্ষমতাসীন দল যে অধিকাংশ বুথেই মস্তানি চায়, এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। বিভিন্ন জেলা প্রশাসন যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এ নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আটকানো তো দূরের কথা, বরং কীভাবে এই লুঠকে আরও মসৃণ করা যায়, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবে জেলা প্রশাসন। পঞ্চায়েত ভোটে সেই ছবিটাই নগ্নভাবে দেখা গেছে। না, কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। প্রতিটি ব্লকই ছিল প্রবলভাবে সন্ত্রাস কবলিত। এমন একটি ব্লকও পাওয়া যাবে না যেখানে বিরোধীরা সব আসনে মনোনয়ন দিতে পেরেছে। এমন একটি ব্লকও পাওয়া যাবে না যেখানে অবাধে ভোট হয়েছে।

এই অবস্থায় জেলা প্রশাসন আশ্বস্ত করছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলেও নিরাপত্তা থাকবে। আচ্ছা বলুন তো, এই চাটুকার জেলাশাসক বা এসপিদের ভরসা করার কোনও কারণ আছে? একজনও ডিএম বা এসপি আছেন যাঁর ওপর ভরসা রাখা যায়! তাঁদের সবিনয়ে একটা কথাই বলতে চাই, আগে ভরসার যোগ্য হয়ে উঠুন, তারপর ভরসা দেবেন।

(১০ এপ্রিল, ২০১৯)

এই থাপ্পড় আসলে তাঁর গালেই

বছর সাতেক আগের ঘটনা। তখনও সারদা কাণ্ড কেলেঙ্কারি হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। তখনও সারদায় লালবাতি জ্বলেনি। তখনও সুদীপ্ত সেন বহাল তবিয়তেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেইসময় বিধানসভায় বাম বিধায়করা দাবি তুলেছিলেন, রাজ্য জুড়ে চিটফান্ডের রমরমা। মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক। বিধানসভায় চিটফান্ড নিয়ে আলোচনা হোক।

ব্যাস, তেড়ে এলেন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা। এ যেন ‘ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি।’ প্রথমে নিজেদের আসনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গেলেন। কাজ হল না। এবার বিরোধীদের আসনের কাছাকাছি এসে মারধর শুরু করলেন। আক্রান্ত হলেন গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। চুলের মুঠি ধরে চড় মারা হল দেবলীনা হেমব্রমকে। যাঁরা মারলেন, তাঁরা পাড়ার মস্তান

নন। তাঁরা সবাই তৃণমূলের বিধায়ক। কেউ কেউ মন্ত্রী। গোটা ব্যাপারটাই ঘটল মুখ্যমন্ত্রী ও স্পিকারের চোখের সামনে। বিধানসভার ভিডিও ফুটেজ থাকার কথা। না থাকলে বুঝতে হবে সারদার অধিকাংশ প্রমাণের মতো এটাও লোপাট হয়েছে। গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি, দেবলীনা হেমব্রমদের হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু এমনই ভয়ের আবহ, চিকিৎসকরা চিকিৎসাই করলেন না। থানাও অভিযোগ নিতে চাইল না।

পরের দিন বিধানসভায় দুরন্ত এক বক্তৃতা করেছিলেন তরুণ ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক আলি ইমরান (ভিক্টর)। স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'আপনার আর মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দেবলীনা হেমব্রমকে চুলের মুঠি ধরে চড় মারা হয়েছে। আপনি চেয়ারে থেকেও কিচ্ছু করতে পারেননি। পরেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেননি। যদি চেয়ারের মর্যাদা রাখতে চান, এখনও সময় আছে, ভিডিও ফুটেজ দেখুন। চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিন। মনে রাখবেন, ওই চড়টা দেবলীনা হেমব্রমের গালে নয়, আপনার গালে মারা হয়েছে। যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের চোখের সামনে সভার এক মহিলা বিধায়ককে চড় খেতে দেখলেন, চড়টা আসলে তাঁর গালেই মারা হল।' বাংলা কাগজগুলি ভিক্টরের এই বক্তব্য

ছাপার সাহস দেখায়নি। কিন্তু বেশ কয়েকটি ইংরাজি ও হিন্দি কাগজে ভিক্টরের এই বক্তব্য ছাপা হয়েছিল।

সাত বছর পর গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় সেই পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। একই দিনে আক্রান্ত হলেন আসানসোলের বাম প্রার্থী গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি ও ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী ফুয়াদ হালিম। কারা এই আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত, একটু চেষ্টা করলেই জানা যায়। কারা এর পেছনে, সেটা বুঝতেও কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পুলিশ হয়ত নাম কে ওয়াস্তে দু একজনকে ধরবে। লঘু ধারা দেওয়া হবে। জামিন পেতে কোনও সমস্যা হবে না।

মুশকিল হল, একই দিনে দু'দুজন লোকসভার প্রার্থী আক্রান্ত হলেন। অথচ, কোনও মহলেই কোনও লজ্জা নেই। নির্লজ্জের মতো কোনও মন্ত্রী বলছেন, এটা ওদের দলীয় কোন্দল। কেউ বলছেন, এটা নাটক। এমন ঘটনার পরেও বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে ধিক্কার নেই। ঘৃণা নেই। মিডিয়াতেও নিছক একটা মামুলি আইটেম। ভাবুন তো, বাম জমানায় যদি তৃণমূলের দুজন প্রার্থী এভাবে আক্রান্ত হতেন, কী তুলকালামটাই না ঘটে যেত! নিন্দার বন্যা বয়ে এত। সাতদিন ধরে সেইসব

ফুটেজ দেখানো হত। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসুদের কুশপুতুল পোড়ানো হয়ে যেত।

আসলে, রোজ এত ঘটনা ঘটছে, সবকিছুকেই এখন মামুলি মনে হয়। মন্ত্রীরাও নির্লজ্জ মিথ্যে বলতে পারেন। যে যাকে খুশি, হুমকি দিতে পারে। কোথাও কোনও নিয়ম মানার দায় নেই। মিডিয়াও বেমালুম চেপে যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন থেকে আদালত, তারাও হয়ে ওঠে যাবতীয় গুন্ডামির দার্শনিক প্রশ্রয়দাতা।

আবার ভিক্টরের সেই ভাষণের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সেদিন বিধানসভায় একেবারে সঠিক জায়গাতেই আলো ফেলেছিলেন ভিক্টর। সাফ জানিয়েছিলেন, এই দেবলীনা হেমব্রমকে নয়। এই থাপ্পড় মারা হল স্পিকারকে। দুই প্রার্থী আক্রান্ত হওয়ার পরও সেটাই বলতে ইচ্ছে করছে। আপাতভাবে মনে হচ্ছে, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি বা ফুয়াদ হালিমকে মারা হল। আসলে, এই থাপ্পড় মারা হল পুলিশ সুপারকে। এরপরেও রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না। এরপরও গলা চড়িয়ে ভাষণ দিয়ে চলেছেন। এই থাপ্পড় হয়ত পিসিমণির গালেও। লুম্পেন বাহিনী কারও কোনও

বাধাই মানছে না। চাইলেও এঁদের আর আটকানো যাবে না। সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন এই লুম্পেন বাহিনীর হাতে কোনও ভাই, কোনও ভাইপোই হয়ত নিরাপদ থাকবে না।

(১১ এপ্রিল, ২০১৯)

বন্যেরা বনে সুন্দর, মিঠুন বাংলায়

অনেকদিন পর আবার প্রকাশ্যে আপনি। তাও সুদূর কার্শিয়াঙে। নিঃশব্দে এলেন। কেউ জানতেও পারল না। ভোটের আবহে আপনি পাহাড়ে। অথচ, একটি কাগজ ছাড়া অন্য কোনও কাগজে সেই উপস্থিতি খবরই হল না। চ্যানেলে চ্যানেলে এত ভোটের কচকচি, অথচ কোথাও আপনার উপস্থিতির উল্লেখ নেই। আপনি প্রচার চাননি ঠিকই, তাই নিঃশব্দেই পাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। কোনও প্রেস-মিডিয়া জানতেও পারেনি। কিন্তু যা হয়, মোবাইল ক্যামেরার যুগ। কোথা থেকে কে ছবি তুলে ফেলবে, তা তো আপনার হাতে নেই। এমনই একটি ছবি ছড়িয়ে গেল। ওই একটা ছবিই তো যথেষ্ট। প্রায় পাঁচ বছর পর আপনার প্রিয় বাংলায় আপনাকে দেখা গেল, এটাই কি যথেষ্ট নয়! তাও বাংলা মিডিয়া কী নির্লিপ্ত! একটি বাংলা দৈনিক ছাড়া কেউ খবরটার গুরুত্বই বুঝল না!

ঠিক পাঁচ বছর আগের কথা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। কোথাও কোথাও চল্লিশ ডিগ্রি ছাপিয়ে গিয়েছিল তাপমাত্রা। তার মাঝেই চলছিল নির্বাচনী প্রচার। বাংলার এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে, ঝড় তুলছিলেন আপনি।

তখন আপনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত। কিন্তু তখনও দিল্লিতে গিয়ে শপথ নেওয়া হয়নি। ফলে, সরকারিভাবে তখনও এম পি হননি। নাই বা হলেন! মিঠুন চক্রবর্তীর আবার এমপি-র তকমা লাগে নাকি! তাঁর নামটাই যথেষ্ট। ধুপসি গরমে অবশ্য আপনাকে ছুটতে হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, আপনার প্রচারের জন্য একটা আলাদা হেলিকপ্টার দেওয়া হয়েছিল। এটুকু তো আপনার প্রাপ্যই ছিল। কারণ, কোচবিহার থেকে পুরুলিয়া আপনাকে উড়তে হয়েছিল। যেখানেই আপনি, সেখানেই যেন জনস্রোত। হওয়ারই কথা। হলেনই বা আপনি তৃণমূলের। তাই বলে আপনার প্রতি কার দুর্বলতা নেই! বাম বলুন, বিজেপি বলুন, কংগ্রেস বলুন-সব বাঙালিই যেন আপনার মধ্যে লড়াই করা সেই নায়ককে খুঁজে পায়। উত্তর কলকাতার গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী কীভাবে বম্বে গিয়ে মিঠুন হয়ে উঠল, সেই লড়াই তো রূপকথার মতোই। প্রাক-সৌরভ যুগে দেশজুড়ে এই বিক্রম কোন বাঙালি দেখিয়েছে!

আপনার একটা ডায়লগ বেশ সুপারহিট— মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। ভোটের বাজারে সেটাকেই একটু যেন বদলে দিলেন। এন কে সলিলের লেখা এই সংলাপটাও আপনার মুখে দিব্যি হিট করে গেল— বোতাম টিপব এখানে, সরকার গড়ব ওখানে। কোচবিহার থেকে নদিয়া, পুরুলিয়া থেকে মেদিনীপুর। পাহাড়, সাগর, অরণ্য সব এলাকাতেই মিঠুনকে দেখার একই উন্মাদনা। সহজ কথা, তৃণমূলের নেতাদের সেই ভিড় টানার ক্ষমতা ছিল না। টলিউডি ঝিঙ্কু-মামনিদেরও ছিল না। সবাইকে টেনে আনতে পারত একটিই নাম— মিঠুন চক্রবর্তী। সেই নামটাকেই এগিয়ে দাও। অন্যদিকে, আপনারও তখন কৃতজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক। সেই প্রথম কোনও দল সম্মান দিয়ে আপনাকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে। আপনার কাছে ওই 'এমপি' ট্যাগলাইনটা হয়ত তেমন কিছুই নয়। তবু এই ন্যূনতম স্বীকৃতিটুকু কে না চায়!

ভোট মিটে গেল। এখানে দিব্যি বোতাম টেপা হল। কোথাও ভোটাররা টিপলেন। কোথাও পাইকারি হারে টিপে গেল ছাপ্পাবাহিনী। ৪২ এ ৩৪ আসনও এসে গেল। কিন্তু কী আর করা যাবে, 'ওখানে' সরকার হল না। ভোটের বাজারে যে মিঠুনকে বাংলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়াতে দেখা

গেল, ভোটের পর তাঁকে মনেও পড়ল না। এত ঘটা করে ফিল্ম ফেস্টিভাল হল। সেই জমকালো মঞ্চে অমিতাভ থেকে শাহরুখ, কমল হাসান থেকে অভিষেকদের ডাক পড়ল। কিন্তু আপনি ব্রাত্যই থেকে গেলেন। পরের বছরগুলোয় জমকালো মঞ্চে আপনাকে আর দেখা গেল না। একটু একটু করে দূরত্ব যেন বাড়তে লাগল। আপনাকে ইডি ডাকছে, আপনি সারদায় জড়িয়ে, এসব জল্পনা ছড়াতে লাগল। পরপর চারবার সর্বোচ্চ আয়কর দাতার পুরস্কার এসেছে আপনার ঘরে, তিন তিনটে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যাঁর বাড়ির শোকেসে, সেই আপনাকে কিনা চিটফান্ডে সন্দেহ করা হচ্ছে! ইডি ডেকে পাঠাচ্ছে! জানাই ছিল, আপনি সব টাকা ফিরিয়ে দেবেন। বাকিদের মতো ধমকে চমকে পাওয়া টাকা নয়। এটা-সেটা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে পাওয়া টাকাও নয়। রীতিমতো পরিশ্রম করে, শুটিং করে অর্জিত টাকা। না ফিরিয়ে দিলেও হয়ত কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আপনি লোকটা যে অন্য ধাতুতে গড়া। তাই ফিরিয়ে দিলেন। অভিমানে নিজেকে একটু একটু করে গুটিয়ে নিলেন।

সংসদে আপনি নেই, প্রচার সভায় আপনি নেই, সিনেমায় আপনি নেই, বহুদিন রিয়েলিটি শোতেও আপনি নেই।

কোথাও ইন্টারভিউতে নেই। ফিল্ম পার্টিতে নেই। এমনকী দেশে আছেন কিনা, তাও ধোঁয়াশা। তীব্র অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক। যে মানুষটা বাংলার জন্য নিঃশব্দে এতকিছু করেছে, সেই লোকটাকে কিনা বাংলার মানুষ ভুল বুঝল! রূপকথার নায়ককে কিনা সারদার কারণে লোকে চিনছে! এতদিনের এত পরিশ্রম, এত লড়াই, সব মিথ্যে! যাঁদের আত্মসম্মান নেই, তারা গলা বাজিয়ে মিথ্যে বলতে পারেন। এর ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করাটা তাঁরা হয়ত অধিকারই মনে করেন। কিন্তু যাঁদের আত্মসম্মান আছে, তাঁদের যন্ত্রণা শুধু তাঁরাই বোঝে। শপথ নেওয়ার আগেই বলেছিলেন, যে কোনওদিন এই এমপি পদ ছেড়ে দিতে পারেন। অনেকে বিশ্বাস করেনি। না করারই কথা। ক্ষমতার জন্য লোকে দিনে-রাতে দল বদলায়, ক্ষমতার জন্য দিনে-দুপুরে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে যায়। সেখানে আপনি কিনা এম পি পদ ছাড়বেন! এতই সহজ নাকি! কিন্তু ওই যে বললাম, আপনি লোকটা বরাবরই একটু অন্য ধাঁচের। নিঃশব্দে পদত্যাগের চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। না, কোনও বিস্ফোরক বিবৃতি দিতে হয়নি। কোনও প্রেস কনফারেন্স করতে হয়নি। কোনও টুইট করতে হয়নি। কোনও হাওয়া গরম করতে হয়নি। এভাবেও ছেড়ে আসা যায়!

সংযম কাকে বলে, বাঙালি বুঝেছে সুচিত্রা সেনকে দেখে। সেই যে গৃহবন্দি হলেন, তিন দশক ধরে বাংলার গ্রেটা গার্বো নিজেকে একেবারে আড়ালেই রেখে দিলেন। তারপর অনেকটাই আপনি। পাঁচ বছর কী করেছেন, কোথায় ছিলেন, তার কতটুকুই বা আমরা জানি! আপনার ঘনিষ্ঠ বলে একসময় যাঁরা দাবি করত, তাঁরাও এই পাঁচ বছরে সেই দাবি সিন্দুকে ঢুকিয়ে রেখেছিল। এই পাঁচ বছরে আপনাকে ধরার, আপনার একটা বাইট বা কোট পাওয়ার কম চেষ্টা তো হয়নি। কিন্তু সবাইকে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয়েছে। কখনও শোনা যায় আপনি অসুস্থ, কখনও শোনা যায় আপনি আমেরিকায়। ব্যাস, আমাদের জানার দৌড় ওই এতটুকুই। এমনকী, এই যে কার্শিয়াঙে এলেন, কবে এলেন, কোন পথে এলেন, তাও রহস্য। বাগডোগরায় বিমানে নেমেছেন! কেউ চিনতে পারল না! নিঃশব্দে হোটেল তৈরি হয়ে গেল! কেউ বুঝতেও পারল না ওটা আপনার হোটেল!

খুব জানতে ইচ্ছে করে, বাঙালির ওপর এখনও কি আপনার তীব্র অভিমান! হলেও দোষ দেওয়া যায় না। সত্যিই তো, এই বাংলাকে এত গৌরব আপনি এনে দিয়েছেন, সেই বাঙালি কিনা আপনাকে ভুল বুঝল! কী ভাবছেন, আপনি আড়ালে

থাকলেই বাঙালি নিজের ভুল বুঝতে পারবে! সে আশা ছেড়ে দিন মশাই। বাঙালি এখনও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চিনতে পারল! সিঙ্গুর থেকে টাটাদের তাড়ানোর পরেও বাঙালির কোনও চেতনা হল? শিল্প নেই, কিন্তু ঢক্কানিনাদ আছে, বাঙালির কী আসে যায়! বাঙালি গড্ডালিকা প্রবাহেই ভেসে যায়। বাঙালি খেউড় শুনতেই ভালবাসে। তাই মঞ্চ থেকে নিরন্তর খেউড় শুনছে। নিজের ঢাক নিজে বাজানো আর মিথ্যের ফুলঝুরি শুনতেই বাঙালি ভালবাসে। এই বাঙালির যেমন শাসক পাওয়া উচিত, বাঙালি ঠিক তেমনটাই পেয়েছে।

আরও এক বাঙালি, তীব্র অভিমানে নিজেকে বন্দি রেখেছেন পাম অ্যাভিনিউয়ের ছোট্ট ঘরে। মানুষটার নাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আপনিও পেরেছেন অভিমান আর নীরবতা দিয়েই তীব্র প্রতিবাদ রেখে যেতে। এই নীরবতা, এই প্রতিবাদটুকু রেখে যাওয়া দরকার ছিল। হাজার হাজার ভাষণের চেয়েও এই নীরবতা বড় ভয়ঙ্কর। তবু আবেদন, আপনাকে সুচিত্রা সেনের ভূমিকায় দেখতে চাই না। তাই, কার্শিয়াঙে আপনার সেই ছবিটা দেখে সত্যিই যেন চেনা মানুষের দেখা পেলাম। মানুষ ঠকে শেখে। আপনিও শিখেছেন। অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছেন, রাজনীতির মঞ্চ আপনার জন্য নয়। মুম্বই, উটি,

আমেরিকা যখন যেখানে খুশি থাকুন। কিন্তু মাঝে মাঝে বাংলায় আসুন। বাঙালির হৃদয়ে আপনি ছিলেন, আছেন। এই কয়েক বছরে তিল তিল করে কত কষ্ট পেয়েছেন, কীভাবে প্রতিদিন রক্তাক্ত হয়েছেন, তা আমরাও বুঝি। ভুল বোঝা বাঙালি যেমন আছেন, তেমনি সংবেদনশীল বাঙালিরাও কিন্তু এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। অন্তত তাঁদের মুখ চেয়ে জনমানসে আবার ফিরে আসুন। মাঝের এই সময়টুকু আপনিও মন থেকে মুছে ফেলুন। আমরাও মুছে ফেলতে চাই। সত্যি করে বলুন তো, বাঙালিকে ভুলে, বাংলাকে ছেড়ে আপনি ভাল থাকতে পারবেন! আমাদের এন কে সলিল নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের (পালামৌ–এর লেখক) একটি প্রাচীন সংলাপকে একটু পাল্টে বলতে ইচ্ছে করে, বন্যেরা বনে সুন্দর, মিঠুন বাংলায়।

(১৬ এপ্রিল, ২০১৯)

রাজনাথ সিংদের ডেকে আনেন কেন!

একেবারেই ফাঁকা মাঠ বলতে যা বোঝায়, তাই। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভা করছেন, অথচ, মেরেকেটে পাঁচশো লোক! হ্যাঁ, এটাই রাজনাথ সিংয়ের প্রাপ্য ছিল।

একজন বুথস্তরের নেতা সভা করলেও বোধ হয় এর থেকে বেশি লোক হয়। সাধারণ একটা পথসভায় লোক গিজগিজ করে। অথচ, রাজনাথ সিংয়ের সভা এত ফাঁকা কেন? কারণ, বিজেপি নেতৃত্বও জানেন, কর্মীরাও জানেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে পদে পদে খুশি করে চলাই এই মানুষটির একমাত্র কাজ। গত পাঁচ বছরে এই বাংলায় বেশ কয়েকবার এসেছেন রাজনাথ। নাম কে ওয়াস্তে দু একটি কথা বলেছেন। কিন্তু দিদিমণি রেগে যাবেন, এমন কোনও কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দু এক লাইন বললেও হেলিকপ্টারে ওঠার আগেই হয়ত আগাম ক্ষমা চেয়ে নেন। অথবা, দিল্লি থেকে

আসার আগে আগাম হয়ত বলে রাখেন, দু এক লাইন বলতে হতে পারে, আপনি কিছু মনে করবেন না।

সবাইকে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করতেই হবে, এমন নয়। যেটা অনুব্রত মণ্ডল বা আরাবুল ইসলামকে মানায়, সেটা নিশ্চয় সৌগত রায় বা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানায় না। যেটা অমিত শাহকে মানায়, সেটা সুষমা স্বরাজকে মানায় না। রাজনাথ যদি তৃণমূলকে আক্রমণ না করতে চান, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্ত মিথ্যা হুঙ্কার ঝাড়ার চেষ্টা কেন? তিনি বললেন, কে কে অত্যাচার করছে, লিখে রাখুন। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। এই হুঙ্কারকে কে পাত্তা দেয়? আপনি যে কিছুই করতে পারবেন না, সেটা গত পাঁচ বছরে প্রতিনিয়ত নিজেই প্রমাণ করে গেছেন।

সিবিআই যেন কার হাতে! যে তদন্ত সাতদিনে হয়ে যেতে পারত, সেটা পাঁচ বছরেও করে উঠতে পারেননি। অধিকাংশ সময়েই সিবিআই নামক বস্তুটি শীতঘুমে থাকে। কার নির্দেশে এই শীতঘুম, বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিমানবন্দরে এত বড় কান্ড বেআব্রু হলে তৃণমূলের কী দশা হত, ভাবতে পারছেন? এত বড় একটা অপকর্ম আড়াল করতে কার সক্রিয় ভূমিকা

ছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। কীসের ভরসায় কেউ কেউ বলতে পারেন, কোনও ফুটেজ দেখাতে পারবে না। চরম আশ্বাস না পেলে এভাবে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। বিজেপি কর্মীরা ভেবে দেখুন, এত বড় একটা অপকর্ম কার জন্য ধামাচাপা পড়ল।

রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব সত্যিই অসহায়। তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান। কিন্তু তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, তৃণমূলকে আড়াল করার আসল আসল মাতব্বরেরা দিল্লিতে বসে আছেন। তাঁরা নানা সমীকরণের অপেক্ষায় আছেন। অমিত শাহ দু একটা মুখস্থ করা ভাষণ দিয়ে যাবেন। কিন্তু যাবতীয় অপকর্ম আড়াল করার জন্য রাজনাথ সিংয়ের মতো লোকেরাও আছেন। এসব জানার পরেও এই রাজনাথদের বাংলার মাটিতে ঘটা করে প্রচার করতে ডেকে আনেন কেন?

(১৮ এপ্রিল, ২০১৯)

ফালতু অভিযোগ থেকে দূরে থাকতে শিখুন

লঘু বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতে গেলে আসল বিষয়গুলো অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। অভিযোগের সংখ্যা বাড়াতে গেলে তার খেসারত অন্যভাবে দিতে হয়। সেটাই বারবার হচ্ছে বামেদের ক্ষেত্রে। নির্দিষ্ট কোনও বিষয়কে সামনে রেখে আন্দোলন করলে বা প্রতিবাদ করলে তার একটা আলাদা মূল্য আছে। কিন্তু একটা দাবির সঙ্গে আরও দশটা দাবি জুড়ে দিলে আসল দাবি কোনটা, সেটাই লোকে গুলিয়ে ফেলে। তখন আসল আন্দোলনটাও ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

অতি সম্প্রতি তার আরও একটা নমুনা পাওয়া গেল। প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকতে হবে, এই দাবি নানা মহল থেকেই উঠছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই বোঝা যাচ্ছে, কেন বাহিনী দরকার। এই আবহে বামেরাও সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। দিল্লিতে বামেরা সেই দাবি

জানালেনও। কিন্তু মুশকিলটা হল তার সঙ্গে আরও একগুচ্ছ দাবি জুড়ে দিলেন। ফলে, আসল বিষয়টাই লঘু হয়ে গেল।

বাঘিনী নামে একটি ছবি বাজারে আসতে চলেছে। অনেক মনে করতেই পারেন, এটি মমতা ব্যানার্জির বায়ো পিক। এই ছবিতে মমতাকে আরও মহান দেখানোর জন্য করা হয়েছে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বামেরা এই ছবি আটকাতে নির্বাচন কমিশনের দরজায় খামোখা কড়া নাড়তে যাচ্ছেন কেন? এত বড় বড় বিষয়গুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে এই বিষয়টাকে নিয়ে এত হইচই করছেন কেন?

১) প্রথমত, এই ছবি মমতার ছায়া অবলম্বনে হলেও, একে বায়োপিক বলা যায় না। কেন্দ্রীয় চরিত্রে যিনি, তাঁর নাম মমতা নয়। পরিচালক দাবিও করেননি এটা বায়োপিক। কিছু মিল, কিছুটা কল্পনা, সব মিলিয়ে একটা ছবি। পরিচালকের এটুকু স্বাধীনতা থাকবে না? এটাকে আটকানোর এত উদ্যোগ কেন?

২) ছবিটা মমতাকে মহান দেখানোর জন্যই বানানো হয়েছে। হোক না, তাতে ক্ষতি কী? এই ছবির জন্য একটা ভোটও এদিক ওদিক হবে বলে বিশ্বাস করেন? এই ছবি ভোটে

কোনও প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয়? তাহলে, খামোকা এর বিরোধীতা করতে যাচ্ছেন কেন?

৩) এই ছবি দেখবেন কারা? যাঁরা মমতাকে পছন্দ করেন, তাঁরা। তাঁরা তো এমনিতেই মমতার সমর্থক। নিশ্চয় বামেরা হলে গিয়ে এই ছবি দেখার জন্য ভিড় করবেন না!

৪) এরকম অনেক ছবি হলে আসে। নিঃশব্দে হল থেকে সরেও যায়। কেউ জানতেও পারে না। এটাও তেমনই একটা তৃতীয় শ্রেণির ছবি হতে চলেছে। কারণ, চাটুকারিতার উদ্দেশ্যে যে ছবি তৈরি হয়, দর্শকদের কাছে তার তেমন মূল্য থাকে না। এই ছবি এমনিতেই খুব অল্প লোক দেখবেন। এমনকী যাঁরা তৃণমূলকে ভোট দেন, তাঁরাও হলে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তাহলে, বামেরা এই ছবির খামোখা পাবলিসিটির দায়িত্ব নিচ্ছেন কেন?

৫) মনমোহন সিংকে কটাক্ষ করে ছবি তৈরি হল। কজন দেখল? কী এমন প্রভাব তৈরি হল? বরং, সেটা বিজেপির নিম্নরুচিকেই প্রকট করল। উরি নিয়ে ছবি হল। সেখানেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। যাঁরা টিকিট কেটে হলে

সিনেমা দেখতে যান, তাঁদের এত বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই। কোনটা কোন উদ্দেশ্যে বানানো হচ্ছে, তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন।

৬) সহজ কথা, এই ছবি চলুক। গুটিকয় লোক দেখবেন। তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তাছাড়া, লোকের সময়ের দাম আছে। এই ছবি লোকাল কেবল বা পাড়ায় পাড়ায় দেখানো হলেও দেখার লোক পাওয়া যাবে না। যেভাবে জোর করে মিছিলে নিয়ে যেতে হয়, হয়ত সেরকমই জোর করে লোককে ধরে বেঁধে দেখাতে হবে। তাছাড়া, যাঁরা তৃণমূলের সমর্থক, তাঁদের অধিকাংশের এত ধৈর্য আছে বলে মনে হয়! তাঁরা হয়ত বলে বসবেন, ধুর, কোনও আইটেম সং নেই। ধুর, কোনও নাচগান নেই। এটা আবার সিনেমা নাকি?

৭) এমনিতেই এই দাবি ধোপে টিকবে না। কারণ, এক্ষেত্রে পরিচালকের যুক্তিটাই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হবে। নির্বাচন কমিশন এই ছবির মুক্তিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না। কোর্টে গিয়েও লাভ হবে না। ফালতু একটা দাবিকে নিয়ে লড়াই করে কোনও ফল পেলেন না। এতে ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল হবে?

৮) তাহলে, এর বিরুদ্ধে একেবারে সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সোচ্চার হতে হল কেন? এই ছবিটাকে উপেক্ষা করা যেত না? সেটাই তো সবথেকে বড় প্রতিবাদ। এইসব ইস্যু তুললে বুথে বুথে বাহিনীর দাবিটা অনেক লঘু হয়ে যাচ্ছে না? অবাধ ভোটের মৌলিক দাবিটা ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে না?

৯) ছবিটা না চললেই বা আপনার কী লাভ? আর চললেই বা কী ক্ষতি? বরং ছবিটা আটকানোর চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে কোন মুখে অনীক দত্তদের পাশে দাঁড়াবেন? কোন মুখে বলবেন, ছবি আটকানো উচিত নয়?

১০) অনেক বামপন্থী বন্ধু রেগে যেতেই পারেন। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো। যেখানে অবাধে ভোট লুঠ হচ্ছে। যেখানে বাহিনী পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে রাজ্য পুলিশ থেকে প্রশাসনের অপদার্থতা এভাবে প্রকট হয়ে উঠছে, সেখানে একটা ছবি বেরোবে কি বেরোবে না, তা নিয়ে নালিশ করা কি খুব জরুরি?

(১৯ এপ্রিল, ২০১৯)

বোঝা গেল, উন্নয়নে কারও আস্থা নেই

দ্বিতীয় দফার ভোটেও ছবিটা বদলালো না। নির্বাচন কমিশন বলতেই পারে, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণ। পেটোয়া কাগজ বা চ্যানেলগুলি বলতেই পারে, উৎসবের মেজাজে ভোট। ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা বলতেই পারেন, এমন ভোট রাজ্যে আগে কখনও হয়নি।

আসলে, ভোটের ছবিটা কেমন, তা যাঁরা টিভিতে চোখ রেখেছিলেন, কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। দুপুর থেকে নেত্রীর তিন তিন খানা সভা। ঝেড়ে উন্নয়নের খতিয়ান, কেন্দ্রকে আক্রমণ, আর কালীমন্ত্র। তাঁর সভা মানেই টিভিতে লাইভ। ব্যাস, দুপুরের পর থেকে আপনি আর কিছুই 'লাইভ' দেখতে পেলেন না। যে নিস্তরঙ্গ দুপুরে বুথ কার্যত ফাঁকা থাকে, যেটা 'ছাপ্পা সংস্কৃতি'র মোক্ষম সময়, সেই সময়েই তিনি লাইভ ফুটেজ খেয়ে নিলেন। সরাসরি তাঁর ভাষণ। অতএব, ভোট

সম্প্রচার মুলতুবি। দিনের শেষে নির্বাচন কমিশনের ভাষণ, দারুণ ভোট হয়েছে। ব্যাস, আপনিও ভাবলেন, দুপুরের পর থেকে যখন কিছুই দেখিনি, তখন নিশ্চয় শান্তিপূর্ণই হয়েছে।

তিনি এত উন্নয়নের বন্যা এই রাজ্যে বইয়ে দিয়েছেন, যে বিরোধীদের খুঁজেও পাওয়ার কথা নয়। একশো শতাংশ ভোটই তো তাঁর। তবু তাঁকে প্রতি সভায় নিয়ম করে বিরোধীদের কুরুচিকর ভাষায় গাল পাড়তে হয়। বলতে হয়, বাম, কংগ্রেস, বিজেপি সবার নাকি সেটিং আছে। আরে বাবা, আপনার যদি একান্ন শতাংশ ভোট থাকে, সারা পৃথিবীর সেটিং থাকলেও তো আপনিই জিতবেন। তাহলে এত দুশ্চিন্তার কী আছে?

এতই যদি উন্নয়নের বন্যা, তাহলে একেকটা কেন্দ্রে এই ধুপসি রোদে চার-পাঁচটা করে সভা করতে হচ্ছে কেন? বিরোধীদের সব প্রচার আটকানোর জন্য ডিএম-এসপিদের লেলিয়ে দিতে হচ্ছে কেন? বিরোধী প্রার্থীদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে কেন? আসল কথা হল, জেলার নেতারা বুঝে গেছেন, উন্নয়নের অষ্টরম্ভা দিয়ে জেতা যাবে না। তাঁরা ভাল

করেই জানেন, উন্নয়ন কতখানি আর কাটমানি বা সিন্ডিকেট কতখানি। তাঁরা জানেন, বালি থেকে কয়লা, গরু থেকে তোলা, সাইকেল থেকে নীল সাদা রঙের কাটমানি কোথায় যায়। সর্বময়ী নেত্রী যতই 'উন্নয়ন–উন্নয়ন' করে বেড়ান, জেলা নেতা থেকে ব্লক নেতা ভাল করেই জানেন, ওই ফাঁপা প্রচারে কিচ্ছু হবে না। পুলিশ, লাঠি, বোমা, হুমকি— এগুলোই অস্ত্র। তাঁরা সেই অস্ত্র নিয়েই নেমেছেন। একটি বা দুটি বুথে নয়। প্রায় প্রতিটি ব্লকে।

এত এত সভা। যেটুকু লোক হচ্ছে, তারা আসলে কারা? একটু মুখগুলো দেখুন তো। আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি, সিভিক ভলান্টিয়ার, প্যারা টিচার, লোকশিল্পী— এঁদের সংখ্যাই সত্তর শতাংশের বেশি। বাকি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানাভাবে যাঁরা উপকৃত, তাঁরা। অর্থাৎ, অধিকাংশই ডাইরেক্ট বেনিফিসিয়ারি। স্থানীয় নেতারা সত্যিই বড় অসহায়। লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বারবার সব সভায় তাঁদেরই ধরে ধরে আনতে হচ্ছে। চাকরি খেয়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে এঁদের সভায় হয়ত আনা যায়। চাইলে মিছিলেও হাঁটানো যায়। কিন্তু সেই ভোটগুলো ইভিএমে ঠিকঠাক জায়গায় পড়বে তো? বারবার জোর করে মিটিংয়ে নিয়ে যাওয়ার রাগটা ইভিএমে প্রকাশ পাবে না

তো? যাঁরা সভায় আসছেন, শুধু তাঁরাই যদি ভোট দেন, সেই ভোটও তৃণমূল কত শতাংশ পাবে, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর পঞ্চায়েতে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, তাঁদের ক্ষোভের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাই, ভোট হলেই মহা বিপদ। কোনও 'উন্নয়ন'এর গল্পেই চিঁড়ে ভিজবে না।

অতএব, একটাই পথ। বানচাল করো। তাই, কেন্দ্রীয় বাহিনীতে এত আপত্তি। তাই রাজ্য পুলিশে এত আস্থা। বিরোধীরা উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই উন্নয়নের খতিয়ানে তৃণমূল নেতাদের কতখানি আস্থা, তা ভোটের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তাহলে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না। তাহলে সাংবাদিক পেটাতেও হত না, ক্যামেরা ভাঙতেও হত না। এত উন্নয়নের পরেও লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এটা কার হার? এটা কার লজ্জা? এটা কার গালে থাপ্পড়? ভোটারদের অনাস্থা তো পরের কথা, আগে নিজের দলের লোকেদের এই প্রবল অনাস্থা হজম করুন।

(১৯ এপ্রিল, ২০১৯)

এত প্রচার, এত আস্ফালন, লোক কই?

তৃণমূলের জনভিত্তি যে এতটা নেমে গেছে, তা সত্যিই আগে ভাবা যায়নি। বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ আপ্তবাক্য আওড়ানো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ঠিকঠাক ভোট হলে কুড়িটি আসন পাওয়াও বেশ মুশকিল। নির্বাচনী সমীক্ষা কী বলছে, তা নিয়ে ভাবছি না। আমার মতামতের সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু ঠিকঠাক ভোট হলে তৃণমূলের ঝুলিতে তিরিশ শতাংশ ভোটও আসবে না। বাকি সত্তর ভাগের মধ্যে কার ঝুলিতে কতটা পড়বে, তা বলা মুশকিল। সেই কাটাকাটির অঙ্কে হয়ত কয়েকটা বাড়তি আসন পেতে পারে।

এত উন্নয়নের ফিরিস্তি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এমন করুণ দশা! সাধারণ মানুষ কই? তৃণমূল কর্মীই বা কই? অধিকাংশ সভায় যা লোক হচ্ছে, তা স্বয়ং মমতা ব্যানার্জিকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেই লোক জোগাড় করতেও

ভরসা সেই পুলিশ। তৃণমূল নেতাদের তেমন কোনও অবদান নেই। অধিকাংশ সভায় কারা হাজির আছেন, সেই মুখগুলো লক্ষ করুন। নিজের নিজের এলাকায় খোঁজ নিন। অঙ্গনওয়াড়ি, আশা কর্মী আর সিভিক ভলান্টিয়ার। এই তিন শ্রেণিই মূলত দর্শক। তাঁদের চাকরির ক্ষেত্রে নানা সমস্যা হতে পারে। নানা ভয় দেখিয়ে তাঁদের আনা হচ্ছে। এর বাইরে ব্লক বা পঞ্চায়েতের কিছু ঠিকাদার লোক পাঠাচ্ছেন। পঞ্চায়েত থেকে নানাভাবে কাজ পেয়েছেন, এমন লোকদের ধরে আনা হচ্ছে। সেই একই লোককে মিছিলে হাঁটানো হচ্ছে। তাঁদেরই সভায় আনা হচ্ছে। প্রতিটি সভার সত্তর থেকে আশিভাগ লোক ডাইরেক্ট বেনিফিসিয়ারি।

এত উন্নয়নের ঢাক বাজানো হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বা তৃণমূল কর্মীদের তেমন অংশগ্রহণ নেই। ভরসা করতে হচ্ছে সেই পুলিশের ওপর। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে? জানি, এখন অনেকেই এটা বিশ্বাস করবেন না। প্লিজ নিজের নিজের এলাকায় খোঁজ নিন। তাহলেই ছবিটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(২০ এপ্রিল, ২০১৯)

কে শক্তিমান, কে দুর্বল, আবার ভাবুন

ভারতে এক দুর্বল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম কী? নিশ্চয় বলে দিতে হবে না, মিডিয়ার প্রচারের ঝড়ে আপনার পাঁচ বছরের শিশুও হয়ত বলে দেবে, তিনি মনমোহন সিং।

ভারতে একজন দারুণ শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী আছেন। যাঁকে সারা পৃথিবী ভয় করে। তাঁর নাম কী? আপনার ওই পাঁচ বছরের পুঁচকে ছেলেটাই হয়ত বলে দেবে, নরেন্দ্র মোদি।

একজন অল্প কথা বলতেন। আরেকজন সারাক্ষণ নিজের ঢাক পিটিয়েই চলেন। তাই যিনি অল্প কথা বলেন, তাঁকে দুর্বল মনে হয়। কিন্তু যিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেন, তাঁকে সবল মনে হয়ে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বোধ হয় অন্যরকম ছবিই উঠে আসবে। মনে করুন, ২০০৬ বিধানসভা নির্বাচনের কথা। মনে করুন ২০০৯ লোকসভা ও ২০১১ বিধানসভার কথা। এই তিনটি নির্বাচনের সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। মুখে হুঙ্কার ছিল না। কিন্তু প্রতিটি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছিল। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেছিল, সুষ্ঠু ভোট করানোটা সরকারের দায়িত্ব।

অথচ, মোদিবাবু অনেকদিন ধরেই হুঙ্কার ছেড়েই যাচ্ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভোটে আর কোনও সন্ত্রাস হবে না। বঙ্গীয় বিজেপি নেতৃত্বও বলে চলেছিলেন, লোকসভার ভোট হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে। সেখানে তৃণমূল কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী দেখা গেল? কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় তুমুল সন্ত্রাস, রক্তারক্তি। দ্বিতীয় দফাতেও শিক্ষা হল না। চোপড়া যেন রণক্ষেত্র হয়ে উঠল। রায়গঞ্জ লোকসভার বিভিন্ন এলাকায় চলল বুথ দখল, ছাপ্পা। মিডিয়া আর কটা জায়গাতেই বা পৌঁছতে পেরেছে! সম্ভবও নয়।

প্রায় ২ হাজার বুথ। মিডিয়া বড়ডোর পাঁচ–ছটা বুথে পৌঁছতে পেরেছে। সেগুলিতেও মিডিয়া আসছে শুনে আগাম সজাগ হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। অপকর্ম ঢেকে ফেলার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেছে। আর যদি ক্যামেরায় ধরা পড়েও যায়, ধমকানো, চমকানো তো আছেই।

সহজ কথা, যে পরিমাণ ছাপ্পা হয়েছে, তার এক শতাংশও ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। বাহিনী নেই শুনে প্রবল উল্লাসে ছাপ্পার চাষ হয়েছে। আর যেখানে বাহিনী ছিল, তাঁরাও তো বুথেই মোতায়েন ছিলেন। রাস্তায় বা গ্রামে যে লোকজনকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ভোটকেন্দ্রে যেতেই দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশন নামক বস্তুটি তেমন কিছুই করে উঠতে পারল না। কেন্দ্রীয় সরকার নামক বস্তুতিও কার্যত অসহায় হয়ে থাকল।

মনমোহন ‘দুর্বল’ ছিলেন। কিন্তু সব বুথে বাহিনীর ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। শান্তিতে ভোট করাতে পেরেছিলেন। আর ছাপ্পা রুখতে পেরেছিলেন। আর একজন প্রবল প্রতাপশালী। কিন্তু তিনি না পারলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবস্থা

করতে। না পারলেন ছাপ্পা ঠেকাতে। চিটফান্ড নিয়ে এত গলা ফাটালেন। কিন্তু পাঁচ বছরে সিবিআই নামক বস্তুটিকে কার্যত ঘুম পাড়িয়েই রাখলেন।

তাহলে, শক্তিশালী কে, আর দুর্বল কে? আরও একবার ঠান্ডা মাথায় ভাবুন।

(২১ এপ্রিল, ২০১৯)

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ

এ কূল ও কূল দু'কূল হারানোর কথা হামেশাই শুনি। এই নির্বাচনে কারও কারও জীবনে হয়ত তেমনটাই ঘটতে চলেছে। কেউ অল্পের জন্য কোনও একটা কূল রক্ষা করবেন। কেউ আবার দুটো কূলই হারাবেন।

বিধানসভায় কংগ্রেসের হয়ে জিতে অনেকেই যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। জিতলেন তৃণমূল-বিরোধী ভোটে। জেতার পর মনে হল, উন্নয়নে শামিল হওয়া দরকার। তাই, পতাকা ধরে নিলেন। অথচ, বিধানসভা থেকে পদত্যাগও করলেন না। আমাদের স্পিকার মশাইও খুবই উদার। গত আট বছরে দলত্যাগ বিরোধী আইনে কাউকেই শাস্তি দিতে পারেননি। ফলে, বাইরে তৃণমূল, কাগজে কলমে বাম বা কংগ্রেস— এই লুকোচুরিটা অনেকদিন ধরেই চলছে।

কিন্তু এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকজনকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। ১) অমর সিং রাই দার্জিলিং বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করে দার্জিলিং লোকসভায় দাঁড়ালেন তৃণমূলের হয়ে। ২) ইসলামপুরের কং বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন রায়গঞ্জ থেকে। ৩) কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার লড়ছেন বহরমপুর থেকে। ৪) নওদার বিধায়ক আবু তাহের লড়ছেন মুর্শিদাবাদ থেকে।

অন্য দলেও এই উদাহরণ আছে। ১) ভাটপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিং বিজেপির টিকিটে লড়ছেন ব্যারাকপুর থেকে। ২) হবিবপুরের সিপিএম বিধায়ক খগেন মুর্মু বিজেপির টিকিটে লড়ছেন মালদা উত্তর কেন্দ্র থেকে।

এই ছজনকেই পদত্যাগ করতে হয়েছে। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু মুশকিলটা হল, হঠাৎ করে বিধানসভার উপনির্বাচন ঘোষণা। ১৯ এবং ২০ মে উপনির্বাচনের দিনও জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তার ফলে, এঁদের অধিকাংশই পড়লেন মহা বিপদে। কীভাবে, একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১) কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এবার রায়গঞ্জ থেকে জেতার আশা খুবই কম। হয়ত তৃতীয় স্থান পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এদিকে, ইসলামপুরও হাতছাড়া হওয়ার জোগাড়। স্ত্রী বা কন্যাকে প্রার্থী করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হল করিম চৌধুরিকে। করিম জিতবেন না হারবেন, বলা মুশকিল। কিন্তু ইসলামপুর থেকে কানাইয়ালালের আর বিধায়ক হওয়া হল না। একদিকে, সাংসদ হওয়াও মুশকিল। অন্যদিকে, বিধায়ক পদও হাতছাড়া। এ কূল, ও কূল দু কূল যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা।

২) অপূর্ব সরকার। একসময় অধীরের ডান হাত বলা হত। ২০০৬ এ অতীশ সিনহার বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন এই অপূর্বকে (ডেভিড)। কান্দি থেকে জিতিয়েও এনেছিলেন। পরপর তিনবার। করা হল পুরসভার চেয়ারম্যানও। সেই অপূর্বই কান্দি পুরসভা বাঁচাতে যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁকেই দাঁড় করানো হল অধীরের বিরুদ্ধে। বিধানসভা থেকে পদত্যাগও করতে হল। জেতার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এদিকে, কান্দি উপনির্বাচনে ফের তাঁর নাম ঘোষণা করাও মুশকিল। তার মানে আগাম স্বীকার করে নেওয়া যে, অপূর্ব লোকসভায় হেরে যাচ্ছেন। ফলে, অপূর্বর

নাম ঘোষণা করা যাবে না। অন্য কাউকেই দাঁড় করাতে হবে। সেই ভোটে নতুন প্রার্থী জিতবেন কিনা, পরে দেখা যাবে। মোট কথা, অপূর্বকে তখন শুধু পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কান্দি উপনির্বাচনে যদি তৃণমূল হারে, তবু রক্ষা। কারণ, ২০২১ এ দাঁড়ানোর একটা সুযোগ থাকবে। কিন্তু যদি তৃণমূল জেতে, তাহলে ২০২১-এও অনিশ্চিত। কী জানি, তখন হয়ত আবার কংগ্রেসে ফিরতে হবে।

৩) আবু তাহের। নওদা থেকে টানা চারবার নির্বাচিত। ২০০১ এ তাঁকেও নির্দল হিসেবে জিতিয়ে এনেছিলেন অধীর। অপূর্ব ও আবু তাহের— এই দুজনের জন্য হাইকমান্ডের সঙ্গেও লড়ে গিয়েছিলেন অধীর। কিন্তু তাঁরাই কিনা নাম লেখালেন তৃণমূলে। আবু তাহেরকে প্রার্থী করা হয়েছে মুর্শিদাবাদে। ভোটও হয়ে গেল। জিতবেন কিনা, বলা মুশকিল। জিতলে এক কূল রক্ষা। এদিকে, নওদায় উপনির্বাচন। নিশ্চিতভাবেই অন্য কাউকে টিকিট দেওয়া হবে। ফলে, এই আসনটি আর আবু তাহেরের দখলে থাকছে না। যদি উপনির্বাচনে তৃণমূল জেতে, তাহলেও বিপদ। কারণ, তখন ২১ এ টিকিট পাওয়াই অনিশ্চিত। কী জানি, অপূর্বর মতো তাঁকেও হয়ত ফিরতে হবে কংগ্রেসে।

৪) অমর সিং রাই। ছিলেন দার্জিলিংয়ের মোর্চার বিধায়ক। এবার পদত্যাগ করে লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী। জিতলে প্রমোশন। কিন্তু হারলে আফশোস করা ছাড়া উপায় নেই। জেতার চান্স খুবই কম। তখন অন্য কোথাও পুনর্বাসন দিতে হবে।

৫) বিজেপিতে যাঁরা গেলেন, তাঁদের মধ্যে অর্জুন সিং হয়ত জিততেও পারেন। সেক্ষেত্রে প্রমোশন। উপনির্বাচনে ভাটপাড়া থেকে সম্ভবত দাঁড় করাচ্ছেন ছেলেকে। ছেলে জিতলেও ভাটপাড়ায় অর্জুনের নিয়ন্ত্রণই রইল। আর যদি বিধানসভায় ছেলে হারেন, সেক্ষেত্রে ভাটপাড়া হাতছাড়া। যদি অর্জুন লোকসভাতেও হেরে যান, তাঁর ক্ষেত্রে লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা— তিন কূলই হারাতে হচ্ছে।

৬) খগেন মুর্মু। বাম ছেড়ে বিজেপিতে। জয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদিকে, উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার সুযোগও নেই। হারলে দুটোই হাতছাড়া। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে প্রার্থী হয়েছেন সৌমিত্র খাঁ, অনুপম হাজরা। না জিতলে তাঁদেরও আক্ষেপ করতে হবে।

৭) সুব্রত মুখার্জি, মহুয়া মৈত্ররাও লোকসভায় লড়ছেন। কিন্তু তাঁদের হারানোর কিছু নেই। জিতলে সাংসদ। যদি একান্তই হেরে যান, বিধায়ক পদটা অন্তত বহাল থাকছে।

৮) মানস ভুঁইয়া। রাজ্যসভার সাংসদ। দাঁড়িয়েছেন লোকসভায়। কিন্তু তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়নি। যদি মেদিনীপুরে হেরেও যান, অন্তত রাজ্যসভার সাংসদ থেকে যাবেন। তবে, দলবদলের জন্য লোকসভায় প্রাথমিক ধাক্কা খেতেই পারেন।

৯) মালা রায়। কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান। দাঁড়িয়েছেন লোকসভায়। তাঁকেও পদত্যাগ করতে হয়নি। দক্ষিণ কলকাতায় জিতবেন, ধরে নেওয়াই যায়। যদি বিরাট কোনও অঘটন ঘটে, যদি কোনও কারণে হেরেও যান, পুরসভার চেয়ারম্যান থাকতে বাধা নেই।

১০) আরও একজন। বিনয় তামাং। ছিলেন জিটিএ প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান। উপনির্বাচনে তিনিই প্রার্থী। জিতলে হয়ত ক্যাবিনেটে আনা হবে। অর্থাৎ, বড় প্রাপ্তিযোগ। কিন্তু হারলে উভয় সঙ্কট। কারণ, জিটিএ চেয়ারম্যান হিসেবে এর মধ্যেই

অনীত থাপার নাম ঘোষণা হয়ে গেছে। ফলে, আর জিটিএ তে ফিরে যাওয়ার উপায়ও থাকছে না। আর উপনির্বাচনে হেরে গেলে এটা অন্তত পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তিনি মোটেই গুরুংয়ের বিকল্প নন। পাহাড়ে পায়ের তলায় মোটেই শক্ত মাটি নেই। সেক্ষেত্রে ঘিসিং, গুরুংদের মতো আগামীদিনে তাঁকেও হয়ত পাহাড়ছাড়া হতে হবে।

এই দশ দফা থেকে কী বোঝা গেল? দলবদলের কড়া মাশুল হয়ত অনেককে চোকাতে হবে। কারও হয়ত দু-কূলই থাকল। কারও হয়ত এক কূল রক্ষা হল। কিন্তু কারও কারও দু-কূল যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মনে পড়ে যাচ্ছে সংস্কৃতের সেই পুরনো প্রবাদটা— স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। পরধর্ম ভয়াবহ। বাংলার রাজনীতিতে যেভাবে আয়ারাম-গয়ারামের সংস্কৃতি এসেছে, যেভাবে দিনে রাতে দলবদল হয়ে যাচ্ছে, কোথাও একটা মোক্ষম শিক্ষা পাওয়া খুব জরুরি। কে বলতে পারে, এই লোকসভা নির্বাচন হয়ত সেই কড়া বার্তাটাই দিয়ে যাবে।

(২৬ এপ্রিল, ২০১৯)

নেত্রীর প্রতি এমন অনাস্থা আর কে দেখিয়েছেন!

অনুব্রতকে ভুল বুঝবেন না। তিনিই একমাত্র বোঝাতে পেরেছেন, নেত্রী কেউ নন। যা করার, তাঁকেই করতে হবে। তিনিই বুঝিয়েছেন, মানুষ ভোট দিলে বিপদ। তিনিই বুঝিয়েছেন, সরকারি উন্নয়নের কথা বলে ভোট হয় না। নেত্রীর প্রতি, তাঁর কাজের প্রতি এমন তীব্র অনাস্থা এর আগে কে দেখিয়েছেন?

প্রায় সবার মুখে এক বুলি। রাজ্য সরকার এত উন্নয়ন করেছে, বিরোধীরা এজেন্ট খুঁজে পাচ্ছে না। শাসকদলের সব নেতা–মন্ত্রীকে এই কথাই বলে যেতে হচ্ছে। পেটোয়া মিডিয়ারও অন্য কিছু বলার উপায় নেই। সন্ধের টিভি বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মুখেই এই সুর।

উন্নয়ন দিয়ে যে জেতা যাবে না, সেটা সবথেকে ভাল বোঝেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি এই ‘উন্নয়ন’ এর এমন প্রতিশব্দ হাজির

করেছেন, যা এর আগে বাংলার ইতিহাসে কেউ করেননি। অভিধান রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সবাই অসহায় অনুব্রতর কাছে। উন্নয়ন শব্দের এমন প্রতিশব্দ তাঁরাও জানতেন না।

অনুব্রতর হুমকি, রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে। এভাবে উন্নয়নকে কেউ কখনও রাস্তায় নামাননি। আর উন্নয়ন যে কার্যত একটা হুমকি, এমনটাও কেউ বোঝাতে চাননি। কখনও চড়াম চড়াম ঢাকের কথা বলেন। কখনও পাচনের কথা বলেন। কখনও নকুলদানার কথা বলেন। তাঁর কথাগুলো যেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মতো। দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

আসলে, অনুব্রত 'সহজ সরল' মানুষ। বাকিদের মতো এত প্যাঁচালো নন। তিনি সারসত্যটা জানেন, যতই উন্নয়ন-উন্নয়ন ঢাক পেটানো হোক, এই ঢাকে ভোট আসে না। মাত্র বছর তিন আগে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুটি নতুন কথা বাজারে ছেড়েছিলেন অনুব্রত। গুড় বাতাসা এবং চড়াম চড়াম ঢাক। চেষ্টার কসুর রাখেননি। পুলিশকে কার্যত বসিয়ে রেখে ঢাক বাজিয়ে গেছেন, গুড় বাতাসা বিলিয়ে গেছেন। কিন্তু এত কাণ্ড করেও নানুর আর হাসনে

পরাজয়। ভাগ্যিস সত্যিটা বুঝেছিলেন, নইলে আরও কয়েকটা আসনে হার নিশ্চিত ছিল।

গত বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মনে করুন। বিরোধীশূন্য না করলে জেলা পরিষদের অবস্থা কী দাঁড়াত, কেষ্টবাবু বেশ ভাল জানেন। তাই কোনও ঝুঁকি নেননি। তাঁর নিজের ফর্মুলায় তিনি প্রথমে ৪১ টি, পরে ৪২ টি আসনেই জিতে নিলেন। ভোট আবার কী? উন্নয়ন লাঠি হাতে, অস্ত্র হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ব্যাস, আর কোনও কথা হবে না।

নির্বাচনের আগে লোকসভা কেন্দ্র পিছু তিনটি-চারটি করে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এত হুঙ্কার। এত উন্নয়নের ফিরিস্তি। এসবের কোনও মূল্যই নেই অনুব্রতর কাছে। তিনি জানেন, এসব ভাষণে কোনও কাজ হবে না। তিনি জানেন, এইসব সভা সমিতি করে কিচ্ছু হবে না। তিনি জানেন, কাজের ফিরিস্তি দিয়েও কিচ্ছু হবে না। যা করার, তাঁকেই করতে হবে।

দিদিমনি যতই শয়ে শয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করুন, যতই কন্যাশ্রী, যুবশ্রী করে বেড়ান, যতই দাক্ষিণ্য বিলিয়ে যান,

এই পথে ভোট হয় না, সেটা সবথেকে ভাল বোঝেন এই অনুব্রতই। তাই 'উন্নয়ন' তত্ত্বকে এভাবে কেউ বিবস্ত্র করেননি। উন্নয়নকে এত অনাস্থা এর আগে কেউ জানাননি।

তাই, একদিক দিয়ে অনুব্রতকে বাকিদের থেকে অনেকটাই সৎ মনে হয়। তিনি অন্তত কোনও ভন্ডামি করেন না। তিনি বুঝিয়ে দেন, যা করার তাঁকেই করতে হবে। তিনি বুঝিয়ে দেন, জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রে জিততে গেলে তাঁর ফর্মুলাতেই জিততে হবে। তিনি বুঝিয়ে দেন, মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া যাবে না। নেত্রী যতই নিজের ঢাক পিটিয়ে যান, ওসব নিতান্তই ফালতু কথা, এটা অনুব্রত ছাড়া এত স্পষ্ট ভাষায় আর কে বুঝিয়েছেন?

(২৯ এপ্রিল, ২০১৯)

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন